কিশোর তরুণদের উপযোগী
দর্শনের মনোমুগ্ধকর আলোচনা

ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা

পিনাকী ভট্টাচার্য

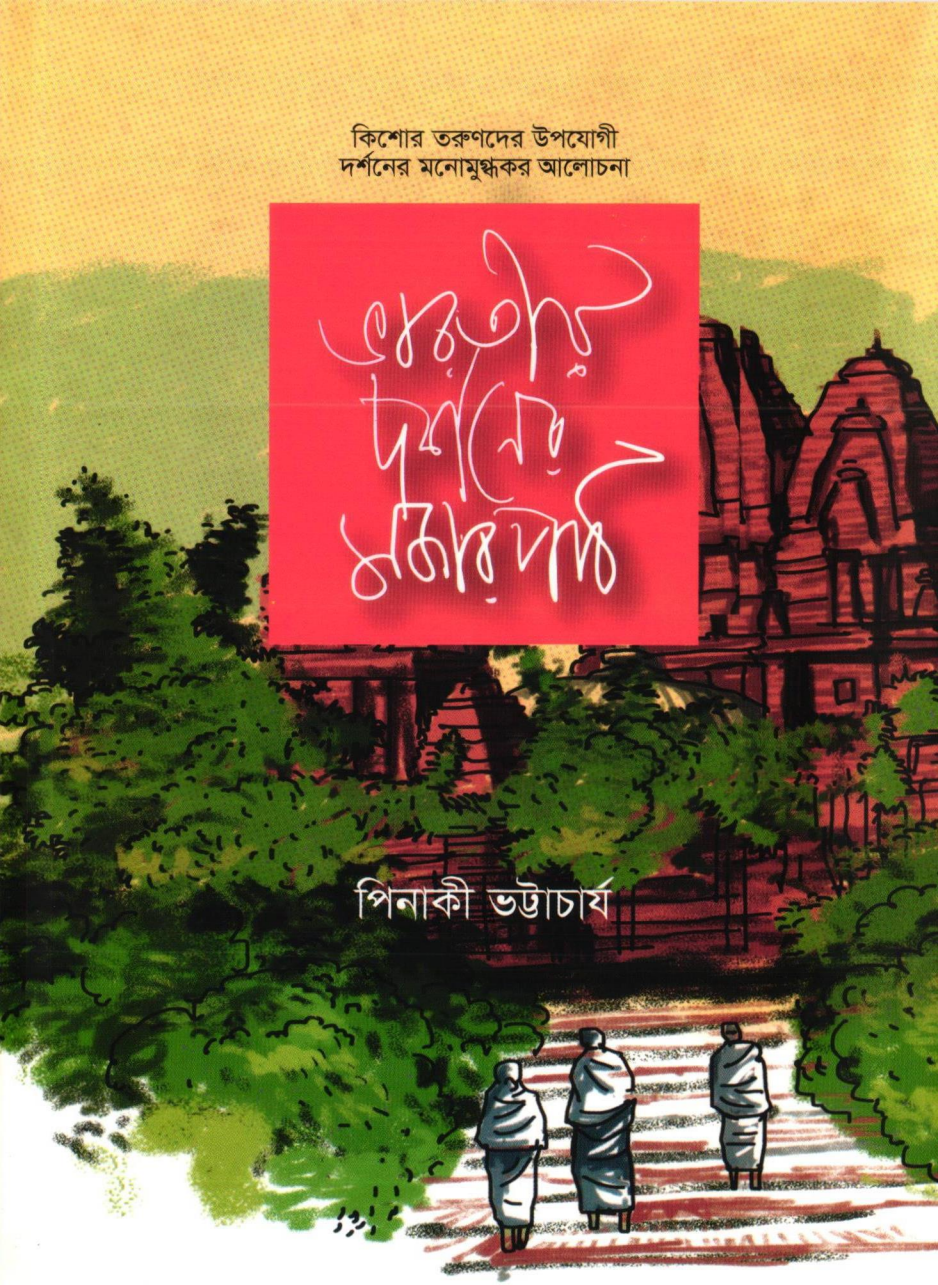

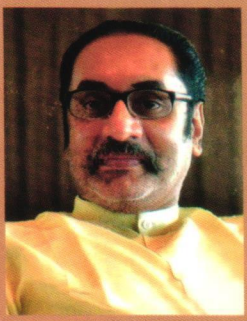

পিনাকী ভট্টাচার্য

তাঁর পরিচয় মূলত ব্লগার এবং অনলাইন এক্টিভিস্ট হিসেবে। ফেইসবুকে আলোচিত ও সমালোচিত। নব্বইয়ের স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে রাজপথ থেকে যে কজন নতুন প্রজন্মের লেখক ও চিন্তক উঠে এসেছেন পিনাকী ভট্টাচার্য তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর লেখার বিষয় বিচিত্র – দর্শন, রাজনীতি, ফিকশন। প্রথম বই দর্শনের এক ক্লাসিক – দেকার্তের 'ডিসকোর্স অন মেথড'-এর অনুবাদ। চিকিৎসক হিসেবে গ্রাজুয়েট এবং এখন স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত ব্যবসার সাথে যুক্ত। এই বই সহ মোট প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১২।

আলোকচিত্র: ডা. রবিউল হক সরকার রানা

দর্শন একটা স্বল্প পঠিত বিষয়। সাধারণভাবে ধরে নেয়া হয় এই বিষয়টাতে অল্প বয়সীদের প্রবেশাধিকার নেই। কিন্তু জটিল সব দার্শনিক প্রশ্ন কিশোর তরুণদের মনেই জন্ম নেয়। এই মহাবিশ্বের রহস্যের মুখোমুখি যত সে দাঁড়ায়, ততই নিজেকে সে নানা প্রশ্ন করতে থাকে। অথচ কিশোর তরুণদের উপযোগী দর্শনের বই নেই। এই বইটায় পিতা আর পুত্রের আলাপের মধ্য দিয়ে মনোহর ভঙ্গীতে ভারতীয় দর্শন কিশোর তরুণদের উপযোগী করে তুলে ধরা হয়েছে। শুধু কিশোর তরুণরাই নয় দর্শনের বিষয়ে যাদের আগ্রহ আছে তারা সবাই এই বইটা পাঠে আনন্দ পাবে, সেটা বলা যায়।

ভারতীয় দর্শনের
মজার পাঠ

https://nagorikpathagar.org

https://nagorikpathagar.org

মোদীর দুর্গে মমতার হানা

পিনাকী ভট্টাচার্য

ঢাকা | চট্টগ্রাম | সিলেট | বাংলাবাজার

https://nagorikpathagar.org

ভারতীয় দর্শনের মজার পাঠ
পিনাকী ভট্টাচার্য

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৭, লেখক

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স : সাইলেনটেক্সট
প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবি ও অন্যান্য স্কেচ : রাজীব দত্ত

তৃতীয় মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮, জুন ২০২১
দ্বিতীয় সংস্করণ : চৈত্র ১৪২৫, মার্চ ২০১৯
প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪২৩, ফেব্রুয়ারি ২০১৭

প্রকাশক : বাতিঘর
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ভবন, ১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলা মোটর, ঢাকা

বিক্রয়কেন্দ্র
বাতিঘর ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ভবন, ১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলা মোটর, ঢাকা
বাতিঘর চট্টগ্রাম : প্রেসক্লাব ভবন, ১৪৬/১৫১ জামাল খান রোড, চট্টগ্রাম
বাতিঘর সিলেট : গোল্ডেন সিটি কমপ্লেক্স, ৬৮২ পূর্ব জিন্দাবাজার, সিলেট
বাতিঘর বাংলাবাজার : রুমী মার্কেট, ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

বাতিঘরের বই ও দেশি-বিদেশি যেকোনো বই অর্ডার করুন
www.baatighar.com

মুদ্রণ : রেডলাইন, ৮/৩ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ৩০০ টাকা

Varotiyo Dorshoner Mojar Path
Amazing reading of Indian Philosophy
by Pinaki Bhattacharya

Bishwo Shahitto Kendro Bhavan
17 Mymensingh Road, Bangla Motor, Dhaka, Bangladesh
Email : baatighar.pub@gmail.com

Price : BDT 300.00 USD 15.00

ISBN : 978-984-8825-68-6

https://nagorikpathagar.org

আমার একজন রাঙা কাকু আর একজন রাঙা মামা ছিলেন।
দুজনেই আমাকে শিশুকাল থেকে অসম্ভব আদর করতেন।
দুজনেই ছিলেন হৃদয়বান
আর দুজনেই ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।
কী অদ্ভুত মিল!

রবি রঞ্জন ভট্টাচার্য আর সরোজ ভৌমিকের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে।

https://nagorikpathagar.org

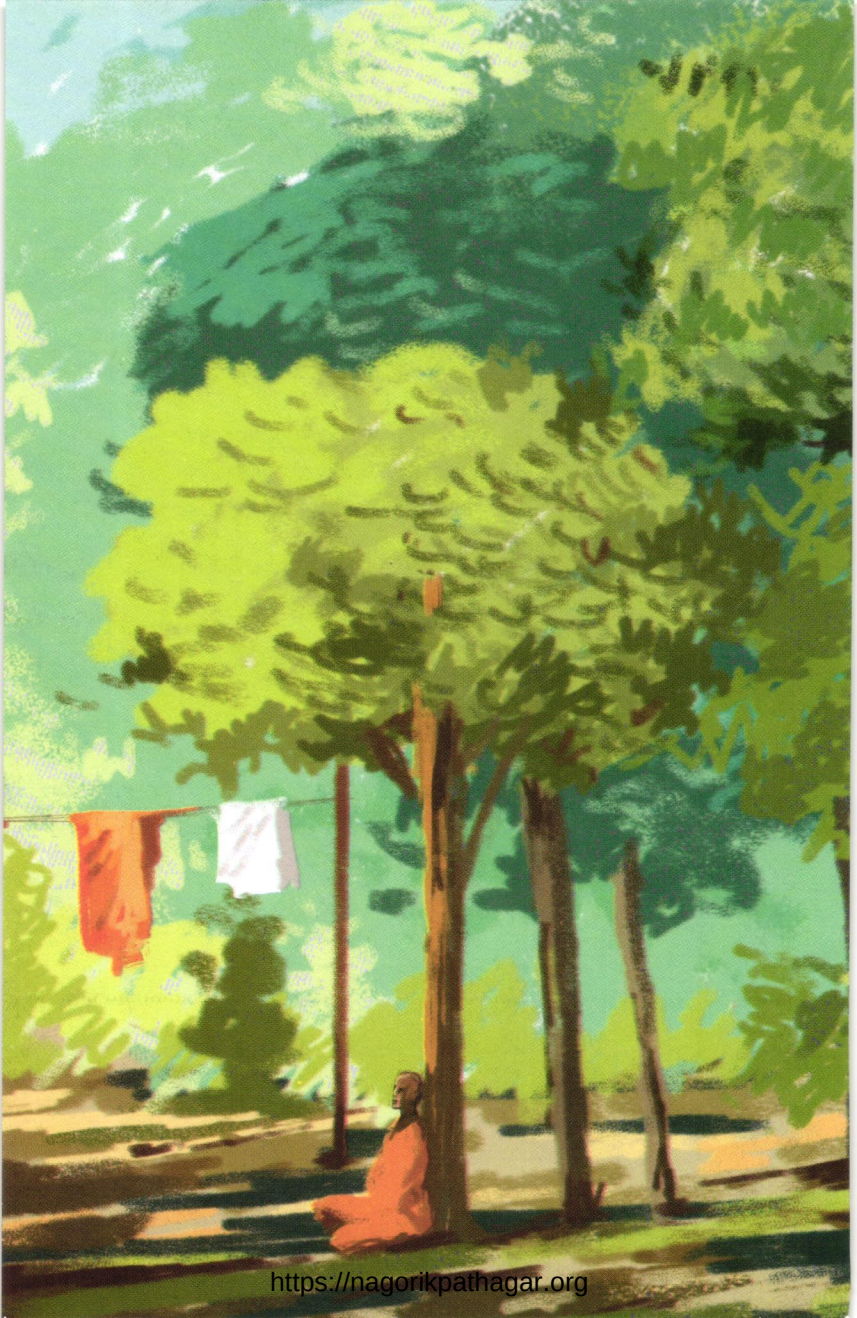

https://nagorikpathagar.org

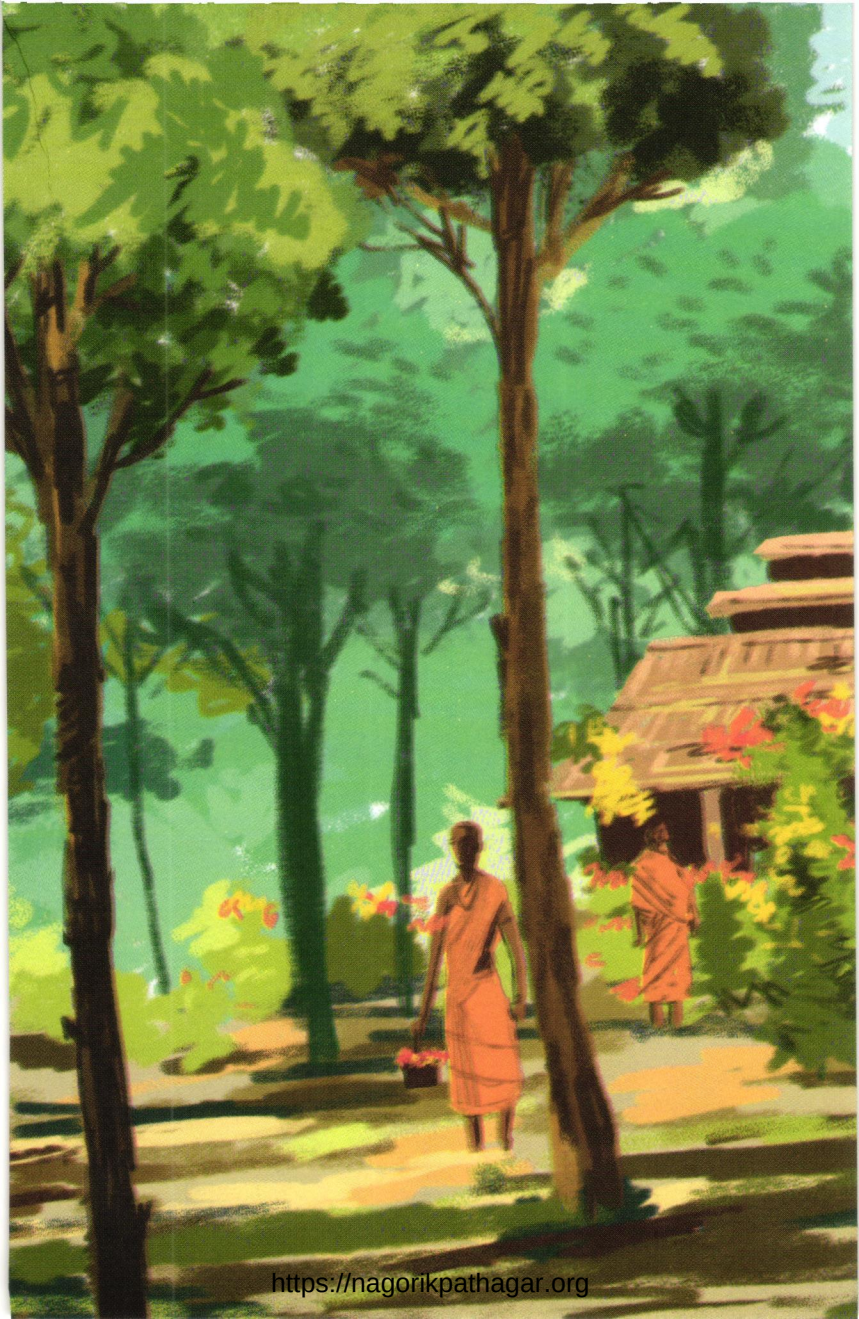

https://nagorikpathagar.org

https://nagorikpathagar.org

ভূমিকা

দর্শন বিষয়টা খুব জটিল বলে সবার ধারণা। বড়রাই দর্শন পড়তে আগ্রহী হন না, আর কিশোরদের কথা তো অনেক পরে। কিন্তু শিশু-কিশোরদের মনেই উদয় হয় সব দার্শনিক প্রশ্ন। আমরা বড়রা হয় এড়িয়ে যাই অথবা 'পাকামো করো কেন' বলে ধমক দিই। শিশু-কিশোরদের উপযোগী করে দর্শনের বই লেখাটা সহজ কাজ নয়। ভারতীয় দর্শন নিয়ে সেই জটিল আপাত দুঃসাধ্য কাজটি করার চেষ্টা করেছি এই ছোট্ট গ্রন্থে।

বইটিতে পিতা-পুত্রের আলাপের আঙ্গিকে ভারতীয় দর্শনের আলোচনা করা হয়েছে। শিশু-কিশোর তো বটেই, দর্শনে অনাগ্রহী বয়স্করাও বইটি যেন আনন্দ ও আগ্রহ সহকারে পড়তে পারেন সেই চেষ্টা করেছি। দর্শন বিষয়ে নতুন প্রজন্মের মধ্যে কিঞ্চিৎ আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

পিনাকী ভট্টাচার্য
ফেব্রুয়ারী ২০১৭, ঢাকা

https://nagorikpathagar.org

https://nagorikpathagar.org

বাবার সবচেয়ে প্রিয় বই কোনটা জানো, মা?

ভ্রু নাচিয়ে পুত্র তার মাকে জিজ্ঞেস করল।

– না জানি না, তুমি বলো।

আমিও উৎসুক জানতে, পুত্র কোন বইটা বলে।

– ফিলজফি : হান্ড্রেড এসেন্সিয়াল থিঙ্কারস। হো হো হো হো!

পুত্রের হাসি আর থামতে চায় না। এবার দৌড়ে র‍্যাক থেকে বইটা পেড়েই নিয়ে আসলো সে।

বইটা আমার প্রিয় কথাটা বাড়িয়ে বলেনি। পাশ্চাত্য-দর্শনের ১০০ মনীষীর চিন্তা একটা ছোট্ট বইতে পাওয়া সহজ কথা নয়। খুব সাবলীল ভাষায় লেখা। এমন একটা বই বাংলা ভাষায় থাকলে বেশ হতো।

– আরেকটা বই বাবার প্রিয়, সেটা জানো। এবারও পুত্রের মুখে হাসির ঝিলিক।

– কী বই বলো তো? আমিই আগ বাড়িয়ে জানতে চাই।

https://nagorikpathagar.org

– ফিলজফি ফর ডামিস। হো হো হো হো! তুমি কি ডামি? পুত্রের চোখে কৌতুক।

এই কথাটাও সত্য। দর্শনের মতো এমন গুরুগম্ভীর বিষয়কে কত চমৎকার রসময় করে উপস্থাপন করা যায় সেটা এই ডামি সিরিজের বইগুলো না পড়লে বুঝতেই পারতাম না। জটিল বিষয় সহজ করে উপস্থাপনের ধারাটা খুব নতুন।

আলফ্রেড হিচককের একটা সিনেমা দেখেছিলাম। সিনেমাটার নাম ছিল 'রোপ'। সেখানে একটা দর্শনের বই সম্পর্কে সংলাপ ছিল এরকম 'বিগ ওয়ার্ডস স্মল ফন্টস, নো সেলস'। সিনেমাটা মুক্তি পেয়েছিল ১৯৪৮ সালে। খুব বেশিদিনের কথা নয়। দর্শন সম্পর্কে ব্যাপক মানুষ আগ্রহী হয়ে ওঠে উইল ডুরান্টের 'স্টোরি অব ফিলজফি' বইটা প্রকাশিত হবার পরে। বইটা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৬ সালে প্রথম। তবে 'রোপ' ছবির সংলাপ দেখে মনে হয় দর্শন সম্পর্কে জনমানুষের মনের সাধারণ ধারণা তখনো পরিবর্তিত হয়নি।

পুত্রকে প্রশ্ন করি, তোমাকে একজন লেখকের দর্শনের বই লেখার গল্প বলি, শুনবে?

– গল্প হলে শুনবো, তবে দর্শন না।

– না না, দর্শন না। গল্প। একবার এক লেখক ভাবল দর্শনের একটি বই অনুবাদ করবে। তার ছোট্ট একটি ছেলে ছিল। রাতে বাসায় ফিরে ছেলেটার পাওনা সময় না দিয়ে প্রতিদিন রাত জেগে সে বইটা অনুবাদ করত। অনুবাদ শেষ হলো। বই তো কেউ ছাপতে চায় না। এর কাছে যায়, ওর কাছে যায়। সবাই খালি ঘুরায়। ছাপব বলে, কিন্তু ছাপে না। বলে, পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে। আবার পাণ্ডুলিপি দিয়ে আশায় থাকে,

https://nagorikpathagar.org

ফোন করে, প্রকাশক ফোন ধরে না।

– বলো কী?

– হুঁ, শেষ পর্যন্ত লেখক প্রকাশের চিন্তা বাদ দিল। তিন বছর পরে এক প্রকাশক বইটা প্রকাশ করতে রাজি হলেন।

– তি-ই-ই-ন বছর !

– হুঁ, তিন বছর। গল্প তো এখানেই শেষ নয়।

– আর কী আছে?

– প্রকাশক বললেন, আপনি তো ডাক্তার মানুষ, দর্শনের বই অনুবাদ করেছেন। একজন দর্শনের নামকরা কাউকে দিয়ে একটা ভূমিকা লিখিয়ে নিতে হবে, তাছাড়া আপনার বই কে কিনবে?

– তারপর সেই লেখক কী করল?

– তার পরিচিত খুব নামকরা একজন দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। সবাই একনামে তাঁকে চেনে।

– তিনি গেলেন উনার কাছে?

– হুঁ গেলেন। পাণ্ডুলিপি রেখে এলেন।

– তারপর?

– তিনি বললেন রেখে যেতে, পড়ে নিয়ে তারপর লিখবেন। এক মাস পরে যেতে বললেন। লেখক খুশি হয়ে ফিরে গেলেন। বইটা ছিল দেকার্তের 'ডিসকোর্স অন মেথড'। এই বইটা আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের প্রবেশিকার মতো।

https://nagorikpathagar.org

– তাহলে তো উনার কোনো সমস্যাই হবার কথা নয়।

– হাঁ, সেটাই তো মজা।

– কী রকম?

– লেখক তো এক মাস পরে গেলেন। তিনি বললেন . . .

– কী বললেন? সাসপেন্সে রেখো না।

– তিনি বললেন, এটা তো ডাক্তারির বিষয়, আপনি ডাক্তার কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিন ভূমিকাটা।

– হো হো হো হো, ডাক্তারি বিষয়? দর্শন, না ডাক্তারি সেটাই বুঝলেন না?

– হুঁ, সেটাই। আরেকটা গল্প আছে জানো?

– ওই বইটা নিয়ে?

– হুঁ, সেটাও মজার।

– বলো শুনি।

– বইটা ছাপা হয়ে হাতে এসেছে। লেখক খুব উৎসাহ নিয়ে তার স্ত্রীকে পড়ে শোনাচ্ছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার স্ত্রী উঠে অন্য ঘরে চলে গেলেন। লেখক বইটা হাতে নিয়ে পড়তে পড়তে সেই ঘরে গেলেন। এবার তার স্ত্রী দৌড় দিলেন অন্য ঘরে।

– হো হো হো হো, দৌড় দিল?

– হ্যাঁ, দৌড় দিল। এই লেখকের নাম জানো?

– আমি কী করে জানব?

https://nagorikpathagar.org

– সেই লেখকটা হচ্ছে আমি।

– হো হো হো হো! তুমি মজা করে লিখতে পারো না?

– তখন পারতাম না। এখন হয়তো পারি। তুমি শুনবে?

– হুঁ শুনবো, যদি মজা করে বলতে পারো।

– তোমার মায়ের মতো পালাবে না তো?

– সেটা তো নির্ভর করবে তুমি কীভাবে বলছ, তার উপর।

– ঠিক আছে, চেষ্টা করব। কাল থেকে শুরু হবে আমাদের আলাপ।

– প্রথমে কী নিয়ে?

– প্রথমে ভারতীয় দর্শন নিয়ে। ঘরের কাছে থেকেই শুরু করা উচিত, তাই না?

– হুঁ, ঠিক।

https://nagorikpathagar.org

পরদিন আলাপের শুরুতেই পুত্রের প্রশ্ন, তুমি যে ভারতীয় দর্শন নিয়ে প্রথম আলাপ শুরু করলে, দর্শন কি এরকম আঞ্চলিক হয়?

– হুঁ। দর্শন মূলত ইউরোপীয় দর্শন আর প্রাচ্যের দর্শন।

– প্রাচ্যের দর্শন আর কী কী আছে?

– চাইনিজ দর্শন, আরব দর্শন।

– বাঙলার দর্শন আছে না?

– হুঁ আছে, তবে বাঙলায় দর্শনকে ঠিক ইউরোপের দর্শনের মতো দর্শন বলা হয় না।

– কী বলা হয়?

– বলা হয় 'ভাব'।

– ভাব মানে? ওই যে 'ভাব নেয়া' বলি সেটা?

– উহুঁ। ভাব মানে 'হয়ে ওঠা'। 'ভু' থেকে ভাব। ওই যে সয়ম্ভু

https://nagorikpathagar.org

কথাটা আছে না? মানে নিজে থেকে জাত।

– সেটার মানে কী? হয়ে ওঠা মানে কী?

– মানে এই চর্চা শুধু মনে আর চিন্তায় নয়, তার সমগ্র জীবনটাই হয়ে ওঠে কোনো একটা কিছুর সাধনার লক্ষ্যে ধাবিত। সে একটা কিছু হয়ে উঠতে চায় – এই ভাব-চর্চার মধ্য দিয়ে।

– সেটা কেমন?

– ধরো তুমি ডাক্তারি চর্চা করে ডাক্তার হয়ে উঠতে চাইতে পারো।

– উনারা কী চর্চা করে কী হয়ে উঠতে চান?

– উনারা ভাব চর্চা করে নিজের দেহে পরমের উপস্থিতি অনুভব করতে চান।

– পরম মানে?

– পরম মানে স্রষ্টা।

– আচ্ছা। তাহলে ভারতীয় দর্শনের সাথে ইউরোপীয় দর্শনের পার্থক্য কী?

– তুমি কয়েকজন ইউরোপীয় দার্শনিকের নাম বলতে পারবে?

– হুঁ, খুব, এই যেমন ধরো, সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল। পুত্র গর্বভরে উত্তর দেয়।

– আর?

– আর জানি না।

– আচ্ছা ঠিক আছে, এবার ভারতীয় কয়েকজন দার্শনিকের নাম

https://nagorikpathagar.org

বলো তো।

– জানি না তো।

– এটা কেমন কথা, তুমি সাগরপারের দার্শনিকদের নাম জানো, আর ঘরের পাশের দার্শনিকদের নাম জানো না। বিষয়টা কেমন হয়ে গেল না?

– হুঁ, তাই তো। না জানলে কী করব?

– এটা তোমার দোষ নয়। ভারতে দর্শনচর্চা হতো সম্প্রদায়গতভাবে। সেজন্য দর্শনগুলো সম্প্রদায়ের নামে পরিচিত হতো। অতীতে কয়েকটি মূল সম্প্রদায়ের উদ্ভব হওয়ার পরে পরবর্তীকালে সেই সম্প্রদায়ের দর্শনগুলোরই বিকাশ হয়েছে।

– তাহলে নতুন নতুন মত আসেনি?

– না, সেই সেই সম্প্রদায়ের মত ও চিন্তাগুলিই বিকশিত হয়েছে।

– তাহলে তো বিপদ, নতুন চিন্তা না আসলে বিপদ না?

– প্রকৃতি সবসময় একটা না থাকলে আরেকটা দিয়ে পুষিয়ে দেয়। মতের বৈচিত্র্য না থাকলেও চিন্তার গভীরতায় ভারতীয় দর্শন অনন্য। সেই উচ্চতায় সমসাময়িক ইউরোপীয় দর্শন পৌঁছাতে পারেনি।

– এই দার্শনিকদের তাহলে কোনো নাম ছিল না?

– ছিল, কিছু কিছু নাম তো পাওয়াই যায়। তবে সেই নামগুলো হয়তো কোনো একক মানুষের নাম নয়। যে নামগুলো পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে কপিল, নাগার্জুন, দিঙনাগ, ধর্মকীর্তি, উদ্যোতকর, উদয়ন, কুমারিল, বাচস্পতি মিশ্র। এ ছাড়াও আরো কিছু মজার নাম আছে।

https://nagorikpathagar.org

– মজার কেন?

– ভারতীয় একটা দর্শনের নাম বৈশেষিক দর্শন। এই দর্শনই ভারতে পরমাণু তত্ত্ব বা পরমাণুবাদের ধারণা এনেছিল। সে-অর্থে বৈশেষিক দর্শনকে ভারতের প্রাচীন পদার্থবিজ্ঞান বলতে পারো।

– তাই নাকি? ভারত পরমাণুর কথা চিন্তা করেছিল সেই সময়?

– হুঁ, অসুবিধা কী? কাছাকাছি সময়ে গ্রিসে ডেমোক্রিটাসও পরমাণুতত্ত্ব চর্চা করেছিলেন।

– তাই? জানতাম না তো!

– এটা মনে রেখো, পরে এ দুয়ের তুলনায় আসব। আগের আলাপে আসি, সেই বৈশেষিক দর্শন যিনি সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তার নাম কী ছিল জানো?

https://nagorikpathagar.org

– কী ছিল?

– তার নাম ছিল 'কণাদ'।

– মানে? কণাদ মানে আবার কী?

– কণাদ মানে যে কণা ভক্ষণ করে।

– সেটা আবার কী? কণা ভক্ষণ করে আবার কেমন করে?

– ওই যে বৈশেষিক দর্শন পরমাণু তত্ত্ব চর্চা করত, তাই সারাক্ষণ পরমাণু কণার কথা বলতে বলতে মানুষ হয়তো ঠাট্টা করে কণাদ নাম দিয়েছিল। তবে জনশ্রুতি আছে তিনি কপোতের মতো রাস্তার ধারে চাউলের কণা, অনেকের মতে, ধানের কণা সংগ্রহ করে জীবনধারণ করতেন। এজন্যই তাঁকে কণাদ বলা হতো। তাঁর নাম ঔলুক্য, ঔলুকের পুত্র। তাই তাঁর দর্শনকে কেউ কেউ ঔলুক্য দর্শনও বলে। আজকেও আমরা বলি না? যেমন ধরো যে টিচার ম্যাথ পড়ান আমরা তাকে যেমন বলি ম্যাথ স্যার সেইরকম অনেকটা।

– ইউরোপে কি সম্প্রদায়গতভাবে দর্শন চর্চা হতো না?

– এই তো খুব ভালো প্রশ্ন করেছ। ইউরোপেও একটা সম্প্রদায় ছিল দর্শন চর্চার। তাদের নাম ছিল পাইথাগোরিয়ান। এদের আলাদা জীবন-পদ্ধতি ছিল, খাদ্য-অখাদ্য বিচার ছিল। যেমন আমাদের সাধক সম্প্রদায়, অনেকটা সেই রকম।

– পাইথাগোরিয়ান মানে সেই জ্যামিতির পিথাগোরাস?

– ঠিক ধরেছ। পিথাগোরাস এই দর্শন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

– তাহলে তো ইউরোপের দর্শনের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের অনেক মিল।

https://nagorikpathagar.org

– মোটেই না। ভারতীয় দর্শনের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস এবং পৌরাণিক কল্পনা। ইউরোপের ইতিহাসে প্রাচীন কাল থেকে দর্শনচর্চা আর ধর্ম-সাধনার মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভেদ তৈরি হয়েছে, সেটা ভারতবর্ষে হয়নি। এখানে ধর্ম ও দর্শনচর্চা একাকার। বলা যায় এখানে জীবনযাপনটাই দর্শন হয়ে ওঠে।

– ইউরোপে কখন কীভাবে ধর্ম আর দর্শন আলাদা হয়েছে?

পুত্রের ক্রমাগত প্রশ্নবাণে একটু দম নিই।

– প্রাচীন দর্শন পুরাণ আর কল্পনাকে আশ্রয় করে বেড়ে উঠেছে। প্রাচীন পৌরাণিক কল্পনার প্রভাব থেকে মুক্তি পেয়েই ইউরোপীয় দর্শনের সূত্রপাত ধরা হয়। খ্রিষ্টের জন্মের ছয়শ বছর আগে গ্রিক দার্শনিক থেলিস বললেন, পানিই পরম সত্তা, পানি থেকেই সবকিছুর জন্ম।

– ঠিকই তো বলেছে, পানি থেকেই তো আদি প্রাণের উৎপত্তি।

– হা হা হা, এত তাড়াতাড়ি ঠিক-বেঠিকের ধাঁধায় ঢুকে না পড়াই ভালো। দর্শনের কাজ ঠিক-বেঠিক নিরূপণ করা নয়। আচ্ছা, আবার পুরনো আলাপে ফিরে আসি। থেলিসের পানিতত্ত্বের কথাটা কিন্তু নতুন নয়। ব্যাবিলনিয়ার পুরোহিতেরা তাঁরও আগে সৃষ্টিতত্ত্ব হিসেবে কল্পনা করেছিলেন দেবতা মার্দুক পানি থেকেই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তাহলে থেলিসের বক্তব্যটা অভিনব হলো কেন? শুধু অভিনব নয়, একেবারে বৈপ্লবিক। উনি উনার প্রস্তাব থেকে দেবতা মার্দুককে বাদ দিয়ে প্রাকৃতিক ঘটনা দিয়ে জগৎকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। দেখো, এখানে প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য অতিপ্রাকৃত ঘটনার প্রয়োজন হলো না। পৌরাণিক কল্পনার সাথে বিচ্ছেদ হলো। ভারতে এই বিচ্ছেদটা হয়নি।

https://nagorikpathagar.org

তাই এখানে ধর্ম ও দর্শন জড়াজড়ি করে থাকে। ভারতীয় দর্শন আলোচনা করতে গেলে এটা খেয়াল রাখা জরুরি। গভীর জটিল দর্শন আলোচনায় দেখবে দেবদেবী এসে হাজির।

– তাহলে ভারতে এই দর্শনের সম্প্রদায়গুলো কী কী?

– এই আলোচনা করতে হবে কালকে। আজ শুধু বলে রাখি, যোগ, বেদান্ত, জৈন – এরা একই সাথে ধর্ম ও দর্শন-সম্প্রদায়।

https://nagorikpathagar.org

সকালে উঠে নাশতা করে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে পত্রিকা নিয়ে বসতেই পুত্র এসে হাজির। মনে হচ্ছে একটু আগ্রহ সঞ্চার হয়েছে তার মনে। আমি পুত্রের দিকে তাকাই উৎসুক চোখ নিয়ে।

– শুরু করবে না আজকে? পুত্র বলে।

একটু আশ্বস্ত হই, আলোচনাটা সে চালিয়ে যেতে চায়।

– হুঁ, নিশ্চয়। কোথায় ছিলাম যেন আমরা কাল রাতে?

– ভারতের দর্শন সম্প্রদায়গুলো কী কী – এইখানে।

– ও হ্যাঁ। দর্শন সম্প্রদায়গুলো। এইদিক দিয়ে তুমি একটা সুবিধাজনক অবস্থানে আছ। ইউরোপীয় দর্শন পড়তে গেলে তোমাকে কমপক্ষে একশোর বেশি দার্শনিকের চিন্তা পড়তে হবে। ওই যে আমার প্রিয় বইটা দেখেছ না হান্ড্রেড এসেন্সিয়াল থিঙ্কার? ভারতের দর্শন জানতে হলে পড়তে হবে শুধু নয়টা দর্শন বা দর্শনচিন্তার নয়টি শাখা। তার মানে ভারতের দর্শন-চিন্তা সম্প্রদায় মাত্র নয়টা।

https://nagorikpathagar.org

– বাহ, এইটা খুব ভালো। ফাঁকিবাজদের জন্য। হো হো হো হো।

– আরো সুবিধা আছে। যেমন ইউরোপীয় দর্শনের প্রায় বিশটার উপরে ধারা আছে। ভারতীয় দর্শনে মাত্র দুইটা।

– মাত্র দুইটা? তাহলে তো খুবই ভালো কথা? কী কী ধারা আছে ভারতীয় দর্শনে?

– আস্তিক-দর্শন, আর নাস্তিক-দর্শন।

– ওরে বাবা, এর মধ্যে আবার আস্তিক-নাস্তিক কেন?

– আজকের দিনে আস্তিক বা নাস্তিক বলতে যা বোঝায় ভারতীয় দর্শনের আস্তিক-নাস্তিক বলতে সেইটা বোঝায় না। মানে এই আস্তিক-দর্শন মানে ঈশ্বর বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু নয়।

– কী তাহলে?

– এই ভাগটা সিম্পল – যারা বেদ মানে, আর যারা বেদ মানে না।

– বেদ কী?

– আসছি পরে। আগে বলে নিই আস্তিক আর নাস্তিক দর্শনগুলো কী কী?

– হুঁ, বলো।

– নাস্তিক-দর্শন তিনটা। লোকায়ত দর্শন বা চার্বাক দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন ও জৈন দর্শন। আর আস্তিক-দর্শন ছয়টা : সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব-মীমাংসা বা মীমাংসা, উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত। হয়েছে নয়টা?

https://nagorikpathagar.org

– হুঁ, হয়েছে। এবার বলো 'বেদ' কী?

– বেদ মানে জ্ঞান, বা পবিত্র ও পরম জ্ঞান। বেদ আর্যদের মূল ধর্মগ্রন্থ। তবুও বেদ হচ্ছে এক নির্দিষ্ট সাহিত্য; ভারতীয় ভাষায় সবচেয়ে প্রাচীন সাহিত্য সংকলনের নাম। একটি গ্রন্থ নয়, বেদ প্রায় শতাধিক গ্রন্থের সমষ্টি। বেদের আবার চারটি শ্রেণি।

– এখানেও আবার শ্রেণি?

– হুঁ, এটা না বুঝলে বা জানলে পরে অনেক প্যাঁচ লাগবে, যা ছুটাতে তোমার সমস্যা হবে। তাই এটা বিস্তারিত বলছি।

– আচ্ছা বলো।

– বৈদিক সাহিত্যকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

১. 'সংহিতা' বা সংগ্রহ : এটা গান, স্তোত্র, মন্ত্র প্রভৃতির সংকলন। এই সংহিতাকেই আমরা বেদ বা চতুর্বেদ বলে জানি। এই সংহিতা চারটি ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ আর অথর্ব বেদ।

২. 'ব্রাহ্মণ' : এটা যাগযজ্ঞ বিষয়ক সুবিশাল সাহিত্য।

৩. 'আরণ্যক' : এটা হচ্ছে অরণ্য বা জঙ্গলে রচিত সাহিত্য। বিশ্ব রহস্যের সমাধান যার লক্ষ্য।

৪. উপনিষদ : এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য হচ্ছে দার্শনিক তত্ত্বের বিচার।

– মাথা তো ঘুরছে। স্তোত্র কী জিনিস?

– স্তোত্র হচ্ছে স্তব বা প্রশংসার উপযোগী মন্ত্র বা কবিতা। আরেকটা কথা বলা দরকার, সেটা হচ্ছে সংহিতা থেকে

https://nagorikpathagar.org

উপনিষদ পর্যন্ত যে বৈদিক সাহিত্য তার সর্বশেষ ভাগ হচ্ছে উপনিষদ, তাই একে বেদান্তও বলা হয়। এই বেদান্তই হচ্ছে ছয় নম্বর আস্তিক-দর্শন 'উত্তর-মীমাংসা'। মনে থাকবে তো?

– হুঁ হুঁ, খুব মনে থাকবে। এবার কী আলাদা আলাদা দর্শনগুলো আলাপ করবে?

– হুঁ, তবে এখন নয়। অফিস থেকে ফিরে। তোমাকেও স্কুলে যেতে হবে।

https://nagorikpathagar.org

রাতে দেখি পুত্র অপেক্ষায়। রাতের খাবার সেরে বললাম, চলো ছাদে যাই। ছাদে আকাশের তারা দেখতে দেখতে দর্শনের আলাপ করা যাবে।

ছাদে উঠলাম। পরিষ্কার আকাশ, মিটমিট করে জ্বলছে অসংখ্য তারা। কত হাজার আলোকবর্ষ দূর থেকে এই আলো আজ আসছে। আমাদের জন্মের কত আগেই হয়তো সেই তারা মরে গেছে, আর আজ আমরা এই আলো দেখছি। কী অপার রহস্য নিয়ে এই বিশ্বজগৎ! আমরা তার কতটুকুই-বা জানি? সম্বিৎ ফিরল পুত্রের প্রশ্নে।

– তোমার প্রথম বই, যেটা দর্শনের ছিল, কেমন চলেছে বাজারে?

– সেটার আরেক গল্প আছে। প্রকাশক বলে বই বিক্রি হয় না। আমার মন খারাপ। লজ্জায় প্রকাশকের কাছে যাই না। একদিন হঠাৎ এক ভদ্রলোক একটা রিভিউ লিখলেন ডেইলি ষ্টারে বইটা নিয়ে। আমি ভাবলাম, না-জানি কত কপি বই বিক্রী হয় এবার। বিকেলে উৎসাহ নিয়ে ফোন দিলাম প্রকাশককে।

https://nagorikpathagar.org

প্রকাশক বললো, হাঁ বই বিক্রী হচ্ছে। আমি দম বন্ধ করে জানতে চাইলাম, কয়টা হয়েছে? প্রকাশক নিরুত্তাপভাবে জবাব দিলেন, একটা।

- হো হো হো হো। শেষ পর্যন্ত একটা বই? তাহলে বই লেখাটা মনে হয় ভাল হয়নি। তাই না?

– ওটা ছিল অনুবাদ। দেকার্তের – আগেই বলেছি। দেকার্ত লিখেছিলেন ফরাসি ভাষায়, সেটা অনূদিত হয়েছে ইংরেজিতে। আমি ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছিলাম। দুই-দুইবার অনুবাদে মূলের কিছু বিচ্যুতি হয়ই। সে যাক, এবার আসো, আমরা আবার আগের আলাপে ফিরে আসি।

– আমার তো আগের আলাপটা ঠিক ভালো করে বুঝে নিতে হবে।

– তাই নাকি, কোথায় বুঝতে হবে?

– এই যেমন ধরো, বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক আর উপনিষদ যে একটার পরে একটা। তার মানে বিশেষ কিছু সংহিতার সাথে বিশেষ আরণ্যক, আবার বিশেষ ব্রাহ্মণ আর বিশেষ উপনিষদ যুক্ত আছে?

– বাহ। বেশ বুঝেছ। হ্যাঁ, ঠিক তাই। তুমি পরের পৃষ্ঠার এই ছকটা দেখলে বুঝতে পারবে কার সাথে কী যুক্ত আছে:

https://nagorikpathagar.org

সংহিতা	ব্রাহ্মণ	আরণ্যক	উপনিষদ
ঋগ্বেদ	১. ঐতরেয় ২. কৌষীতকি	১. ঐতরেয় ২. কৌষীতকি	১. ঐতরেয় ২. কৌষীতকি
সামবেদ	১. পঞ্চবিংশ বা, তাণ্ডমহা ২. ষড়বিংশ ৩. জৈমিনীয়	১. আরণ্যক-সংহিতা ২. আরণ্যক-গান ৩. জৈমিনীয়-উপনিষদ-ব্রাহ্মণ	১. ছান্দোগ্য ২. কেন্
কৃষ্ণ-যজুর্বেদ	১. কঠ ২. তৈত্তিরীয়	১. কঠ ২. তৈত্তিরীয়	১. কঠ ২. তৈত্তিরীয় ৩. মৈত্রী বা মৈত্রায়ণীয় ৪. শ্বেতাশ্বতর
শুক্ল-যজুর্বেদ	১. শতপথ	১. শতপথ	১. বৃহদারণ্যক ২. ঈশা
অথর্ববেদ	১. গোপথ		১. মুণ্ডক ২. মুণ্ডুক্য ৩. প্রশ্ন

এখন তুমি বুঝতে পারবে যদি কেউ কঠ উপনিষদের কথা বলে তাহলে সেটা কৃষ্ণ যজুর্বেদের সাথে যুক্ত। তেমনি ছান্দোগ্য উপনিষদ সাম বেদের সাথে যুক্ত। এখানে একটা জিনিস বলে রাখলে ভালো, পরে এটা কাজে লাগবে।

– কী সেটা?

– সেটা হচ্ছে বেদ কিন্তু লিখিত ছিল না। আদিকালে সব ধর্মগ্রন্থই এমন ছিল; লিখিত বইয়ের আকার পেয়েছে পরে। সব ধর্মগ্রন্থই প্রথমে মুখে মুখে মানুষ মুখস্থ রাখত।

https://nagorikpathagar.org

– তাই নাকি, সর্বনাশ! এই বিশাল বিশাল বই মুখস্থ?

– হুঁ, সেজন্যই ধর্মগ্রন্থগুলো ছন্দে রচিত। এতে মনে রাখার সুবিধা হয়। তবে বেদ ও উপনিষদের ক্ষেত্রে মজার বিষয় হচ্ছে এগুলো যেমন গদ্যেও লেখা হয়েছে, তেমনি পদ্যেও লেখা হয়েছে। তোমাকে একটা একটা করে বলি। মনে রাখতে হবে কিন্তু।

– আচ্ছা বলো, চেষ্টা করব।

– সবচেয়ে পুরনো ও গদ্যে রচিত উপনিষদ হচ্ছে :

১. ঐতরেয়
২. বৃহদারণ্যক
৩. ছান্দোগ্য
৪. তৈত্তিরীয়
৫. কৌষীতকি

এই দলের পরে এবং আংশিকভাবে পদ্যে রচিত উপনিষদ হচ্ছে :

৬. কেন

আরও পরে এবং সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পদ্যে রচিত উপনিষদ হচ্ছে :

৭. ঈশা
৮. কঠ
৯. শ্বেতাশ্বতর
১০. মুণ্ডক
১১. প্রশ্ন

https://nagorikpathagar.org

একেবারে সবার শেষে এবং গদ্যে রচিত উপনিষদ হচ্ছে :

১২. মৈত্রী (বা মৈত্রায়ণীয়)
১৩. মুণ্ডুক্য

– ওরে বাবা, এসব আমি মনে রাখতে পারব না।

– হা হা হা, মনে রাখার দরকার নেই, এগুলো আমারও মনে থাকে না। যখন দরকার হবে বই দেখে নেবে তাহলেই হলো। কিন্তু বিষয়টা কী সেটা জানা থাকলে কোথায় খুঁজতে হবে সেটা বুঝতে পারবে।

– আচ্ছা। এবার তাহলে কি আমরা আলাদা আলাদা দর্শন নিয়ে আলাপ করব?

– এর আগে আরো কয়েকটা ছোট ছোট জিনিস জেনে নিতে হবে। নইলে ভারতীয় দর্শন কী কী নিয়ে কীভাবে আলাপ করেছে সেটা বুঝতে একটু অসুবিধা হবে।

– আচ্ছা কী কী জিনিস?

– এই যেমন ধরো, 'দর্শন' বিষয়টা কী? 'দর্শন' কী বিষয় নিয়ে কাজ করে এবং 'দার্শনিক অনুসন্ধান' কী?

– তাই তো, দর্শন কী নিয়ে কাজ করে সেটাই তো জানা হয়নি! সেটা বলো আগে।

– সাধারণভাবে দর্শন হচ্ছে মানুষের চিন্তার গণ্ডি বাড়ানোর নিরন্তর চেষ্টার নাম। দর্শন কোনো বিজ্ঞান নয় যে সেটা তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহ করে কোনোকিছু প্রমাণ বা অপ্রমাণ করবে। এটা কোনো কলা বা আর্টও নয় যে তার অনুভব করা জগৎকে সে তার কল্পনা দিয়ে প্রকাশ করবে। দর্শন এমন একটি অনন্য

https://nagorikpathagar.org

পদ্ধতি যা বিজ্ঞান এবং কলার মধ্যবর্তী ধূসর এলাকা নিয়ে কাজ করে।

– কীভাবে বুঝব কোনটা দর্শনের বিষয়, আর কোনটা দর্শনের বিষয় নয়?

– দর্শনের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর অনুসন্ধানের পদ্ধতি ও ফলাফল নিয়ে সাধারণভাবে সবাই একমত হয় না। এর কারণ হচ্ছে দার্শনিকেরা যে-সমস্ত বিষয় নিয়ে কাজ করেন সেটা এমন একটা ধূসর চিন্তার এলাকা যেখানে একমত হওয়া অসম্ভব। বিজ্ঞানে সাধারণভাবে ব্যাপক ঐকমত্য থাকে। কিন্তু বিজ্ঞান এমন কিছু প্রশ্নের জন্ম দেয় যেগুলোর উত্তর বিজ্ঞানের মধ্যে থেকে পাওয়া যায় না। দর্শন সেগুলো নিয়ে কাজ করে। যেমন ধরো মানব ক্লোনিংয়ের বিষয়টা। বিজ্ঞান মানব ক্লোনিং জানে, কিন্তু এই মানব ক্লোনিংয়ের চর্চা শুরু হবে কি না সেটার বিতর্ক বা ফয়সালা বিজ্ঞানের পরিমণ্ডলে হয় না; হয় দর্শনের পরিমণ্ডলে। শুধু বিজ্ঞান নয়, জ্ঞানের সব শাখার ক্ষেত্রেই, যেখানেই উত্তর না পাওয়া যায় তার উত্তর খোঁজার দায়িত্ব পড়ে দর্শনের।

– মজা তো! তাহলে কি দর্শন কোনো জটিল সমস্যার উত্তর খোঁজার চেষ্টার নাম?

– উহুঁ, শুধু তাও নয়। যেমন ধরো, আমেরিকা এবং আগেকার সোভিয়েত রাশিয়া দুই পরাশক্তি তৈরি হয়েছিল দুই দার্শনিকের চিন্তার উপরে ভিত্তি করে। টমাস পাইন আর কার্ল মার্ক্স। তার মানে দর্শনের চিন্তা সমাজ ও রাজনীতিতে নানা নতুন প্রকল্পের জন্ম দিতে পারে। দর্শন পড়তে গেলে তুমি একটা চিন্তার বিপরীতে অসংখ্য প্রশ্নের শৃঙ্খল পাবে। দর্শনের কাজ 'সত্য'

https://nagorikpathagar.org

নির্ণয় করা নয় – বরং নানান ভাবে চিন্তার পর্যালোচনা করে যাওয়া।

– একটু কঠিন হয়ে গেল আলাপটা।

– তুমি নিজেও কিছুটা জেনে নেবে তাই এভাবে বললাম। তুমি জানবে কার্ল মার্ক্স কে, কী তার চিন্তা; টমা পাইন কে, কী তার চিন্তা। দর্শনের আলোচনায় এভাবেই গভীরে যেতে হয়। একটা বিষয়ের সাথে আরেকটা বিষয় এখানে জড়িয়ে থাকে। তাই চাইলেও সেগুলো বাদ দিয়ে আলাপটা চালিয়ে যাওয়া যায় না। তবে ভারতীয় দর্শনের মূল জিজ্ঞাসা আরও একটু সরল।

– কী সেটা?

– ভারতীয় দর্শনের মূল জিজ্ঞাসা – জগৎ ও আত্মা এবং এই দুটোরই উপরে আছে একটি পরমতত্ত্ব। এই পরমতত্ত্বকে নানাজনে নানাভাবে বর্ণনা করেছে। কেউ এটাকে বলেছে পরমার্থ, পরমাত্মা, বা খুব সাধারণভাবে পরম। এগুলোই আলোচ্য বিষয়। ভারতীয় দর্শনে আলোচ্য বিষয়কে বলে 'প্রমেয়'। আর যে বিচারের সাহায্যে এই আলোচ্য বিষয়কে জানা যায় তাকে 'প্রমাণ' বলে। তাহলে খুব সহজে বলা যায় ভারতীয় দর্শনের বিচার্য বিষয় প্রমাণ ও প্রমেয়। এখানে ইউরোপীয় দর্শনের সাথে ভারতীয় দর্শনের একটা বড় তফাত আছে।

– কী সেই তফাত?

– ইউরোপীয় দর্শনে প্রমাণ বা জ্ঞানের উৎপত্তির কথাটা বড় হয়ে দেখা দেয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে, বিশেষভাবে জার্মান দার্শনিক কান্টের চিন্তায়। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে সেটা প্রথম

https://nagorikpathagar.org

থেকেই আলোচ্য বিষয়।

– প্রমাণ কেন ভারতীয় দর্শনে প্রথম থেকেই আলোচ্য প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে?

– খুব ভালো প্রশ্ন করেছ। খ্রিষ্টের জন্মের ৬০০–৭০০ বছর আগে থেকেই যখন ভারতে দার্শনিক চিন্তা পরিস্ফুট আকার ধারণ করতে থাকে তখন থেকেই নাস্তিক ও আস্তিক দর্শনের পার্থক্যটা স্পষ্ট হতে থাকে। আর তুমি তো জানো বেদ মানা আর না মানাই আস্তিক আর নাস্তিক দর্শনের মূল তফাত। বেদে বিশ্বাসীরা বেদকে জ্ঞানের উৎস মনে করত। তারা মনে করত সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয়, অতি প্রাকৃত বিষয়ের জ্ঞান – পরলোক ও পরমাত্মার জ্ঞান – এই বেদই দিতে পারে। এই জ্ঞানলাভের আর কোনো উপায় নাই। বেদে অবিশ্বাসীরা এই কথা মানতেন না। বেদ ছাড়াও জ্ঞানলাভ সম্ভব, এটাই তারা মনে করতেন। বিশ্বাসীদের মতে বেদ একটা প্রমাণ আর অবিশ্বাসীদের মতে বেদ প্রমাণ নয়। এখানেই যেহেতু বিভেদ সেই জন্য প্রথম থেকেই ভারতীয় দর্শনে 'প্রমাণ' বিষয়টা এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

– তাহলে তো অবিশ্বাসীরা ঠিকই বলেছে, সব জ্ঞান কি বেদে থাকবে?

– হা হা হা হা। দার্শনিক আলোচনায় এত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া যায় না। এটায় একটা নোক্তা দিয়ে রাখো, পরে অন্য সময় আলাপ করা যাবে। তাও তোমাকে একটা উদাহরণ দিই। ধরো, গভীর সমুদ্রে একটা নৌকায় তুমি আর আমি আছি, আর আছে নৌকার চালক। সমুদ্রে পড়লে বাঁচার কোনো আশা নেই। এমন সময় যদি নৌকার চালক তোমাকে বলে যে

https://nagorikpathagar.org

পানিতে ঝাঁপ দাও। তুমি দেবে?

– উহুঁ, দেব না। দিলেই তো মৃত্যু।

– এখন যদি নৌকার মাঝি বলে নৌকা ডুবতে বসেছে, নৌকার ওজন কমাতে হবে। আপনাদের একজনকে নৌকা থেকে ঝাঁপ দিতে হবে।

– কী মুশকিল!

– আমি নির্দ্বিধায় ঝাঁপ দেব নৌকা থেকে। কারণ তাহলে তুমি বেঁচে থাকবে। আমার কোনো কষ্ট হবে না, দুঃখ হবে না, এমনকি ঝাঁপ দেয়া উচিত হবে কি হবে না, সেই চিন্তাও করব না। তাই না?

পুত্র নিশ্চুপ। তার চোখের কোণে চিকচিক করছে পানি।

– এই ঝাঁপ দেয়ার কাজটা কি যুক্তি দিয়ে বিচার করা যায়? কারণ পৃথিবীর কাছে আমরা দুজনই প্রাণ। বয়সের কারণে আমার জানা-বোঝা তোমার চাইতে বেশি। আমার পড়াশোনা তোমার চাইতে বেশি। পৃথিবী এই মুহূর্তে আমার কাছে থেকে প্রতিদান পাচ্ছে, হয়তো আরো কিছুদিন পাবে। ঠিক আমার এই জায়গায় আসতে তোমাকে আরো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। তাই না?

– হুঁ।

– তাহলে আমি ঝাঁপ দেব কেন? কারণ তোমার আর আমার সম্পর্ক যুক্তির বাইরের জগতের বিষয়। অর্থাৎ একটা হলো যুক্তির জগৎ, যা হলো ফিজিক্যাল বা ইহজগৎ। আর আরেকটা হলো নন-ফিজিক্যাল বা অধিবিদ্যক জগৎ। এটা যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। অবিশ্বাসীরা যুক্তি দিয়ে সব ব্যাখ্যা করতে

https://nagorikpathagar.org

চায়। দ্বন্দ্বটা এখানেই হয়।

– কিন্তু সেই যুক্তির বাইরের জগতের ব্যাখ্যা কি বেদে আছে?

– ওই যে ভুলে বসে আছো। আমি বলেছি না, সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয়, অতি-প্রাকৃত বিষয়ের জ্ঞান; পরলোক ও পরমাত্মার জ্ঞান – এসব বেদে আছে বলে তারা বিশ্বাস করত। ওটাই তো যুক্তির বাইরের জগৎ। সেই ব্যাখ্যা পূর্ণাঙ্গ নয়। কিন্তু তাই বলে একেবারে ফেলে দেয়াটা তো বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তাই না?

– রাত অনেক হয়েছে। একটু একটু ঠাণ্ডা হাওয়াও দিচ্ছে।

– হ্যাঁ, চলো আজকের মতো ঘরে ফেরা যাক।

https://nagorikpathagar.org

গতরাতে দর্শনের প্রাথমিক আলাপের যে অংশটা বাদ ছিল সেটা হচ্ছে 'প্রমাণ'। আজ সকালে নাশতার পরে পুত্রের আগমন। সে প্রমাণ বিষয়টা বুঝতে চায়। আমি বলতে শুরু করি।

– জগৎ সম্পর্কে আমরা যা যা জানতে চাই, সেটা কিছুর উপরে ভর করে জানতে চাই, যার উপর ভর করে জানতে চাইলাম সেটাই প্রমাণ। যেমন ধরো, তুমি আমার সামনে বসে আছো কি না, এটা আমি কীভাবে জানব? তোমাকে চোখে দেখছি, চোখের দেখা ভুল হলে আমি তোমাকে ছুঁয়ে দেখতে পারব। আমি চোখ বন্ধ করে থাকলে তুমি কথা বললে আমি বুঝব তুমি আছো, আর কতদূরে আছো সেটাও অনুমান করে নিতে পারব কিছুটা। তাহলে আমি চোখের দেখা, ছুঁয়ে দেখা, তোমার মুখের কথা কানে শোনা এসব ব্যবহার করে তুমি যে আছো সেটার প্রমাণ পাচ্ছি। এগুলো হচ্ছে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। ভারতীয় একেকটা দর্শন একেকটা প্রমাণকে গ্রহণ করে বা বর্জন করে। সেভাবেই এই দর্শনগুলোর গুণ বিচার করতে হয়।

দর্শনের আলোচনায় এই প্রমাণের বিষয়টাকে বলে জ্ঞানতত্ত্ব বা

https://nagorikpathagar.org

Epistemology। এটি একটি অনিবার্য অনুষঙ্গ। এই জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়টি কী? এক কথায় বলতে গেলে জ্ঞানতত্ত্ব জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে। ধরো, আমি মটরশুঁটির মতো একটি অতি ক্ষুদ্র এবং প্রায় গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে জানতে চাই বা জ্ঞান চাই। আমার কী কী বিষয় জানতে পারি? আমরা জানতে পারি মটরশুঁটির গড় ওজন, আর্দ্রতা, জলীয় অংশের পরিমাণ, পুষ্টিগুণ, রং, গন্ধ, বর্ণ, স্বাদ, চাষাবাদ পদ্ধতি, বিভিন্ন রোগ, সেই রোগের নিদান, উৎপাদন খরচ, সংরক্ষণ পদ্ধতি, ইত্যাদি। আরো গভীরে গিয়ে জানা যেতে পারে জেনেটিক কোড। কিন্তু এখানেই কি মটরশুঁটি নিয়ে জ্ঞানের শেষ? মোটেও না। এরকম কয়েক লক্ষ তথ্য সংগ্রহ করলেও এই তুচ্ছ মটরশুঁটি নিয়ে জানার শেষ হবে না। তারপরেও জানতে হবে এক্সট্রিম কন্ডিশনে (মানে অতি তাপে বা অতি ঠাণ্ডায় বা মহাশূন্যে) এই মটরশুঁটির তথ্য কি একই থাকে কি না। বুঝতেই পারছো অনেক ক্ষুদ্র বিষয়েও আজকের অগ্রসর বিজ্ঞান শিশুতুল্য। অতি ক্ষুদ্র মটরশুঁটি নিয়ে আমাদের জ্ঞান অর্জন এখনো শেষ হয়নি, কখনো হবে কি না সেই নিশ্চয়তাও ঠিক দেয়া যাচ্ছে না।

– তাহলে ভারতীয় দর্শনে প্রমাণ বা জ্ঞান অর্জনের পথ কী কী?

– ভারতীয় দর্শনে জ্ঞান অর্জনের পথ ছয়টি : প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপাত্তি (Postulation) ও অনুপলব্ধি (Non-cognition)

– বাহ আস্তিক দর্শনও ছয়টা, আবার প্রমাণও ছয়টা? তাহলে এই ছয়টা বলতে কী কী বোঝায়? অনেকগুলো তো নাম দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই।

https://nagorikpathagar.org

– প্রথমটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ। আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি। ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে যে জ্ঞান পাই সেটাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। ইন্দ্রিয় মানে শুধু শরীরী ইন্দ্রিয় বা চোখ-কান-নাক-ত্বক ইত্যাদি নয়। বরং তুমি ইন্দ্রিয় বলতে শরীরী ইন্দ্রিয় এবং তার বর্ধিত রূপকেও বুঝতে পারো।

– সেটা আবার কেমন?

– যেমন চোখ দিয়ে দেখি। এটা একটা শরীরী ইন্দ্রিয়। এখন চোখের বর্ধিত রূপ মাইক্রোস্কোপ বা টেলিস্কোপ। সেটা দিয়েও তুমি যা দেখবে সেটাও প্রত্যক্ষ জ্ঞান হবে।

– এর পরে আছে অনুমান। অনুমান বিষয়টি বুঝতে আমাদের খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। যেমন ধোঁয়া দেখলে আমরা অনুমান করি সেখানে আগুন আছে। পথঘাট ভেজা দেখলে আমরা অনুমান করি বৃষ্টি হয়েছে, ইত্যাদি। আমাদের বাঙালি মননে এই 'অনুমানের' অবস্থান অবিশ্বাস্য। তুমি লক্ষ করে থাকবে আমরা গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারণ করি 'মনে হয়' 'বোধ হয়' 'সম্ভবত' 'আমি ভেবেছিলাম'। ভারতীয় দর্শনের এই অনুমানপ্রিয়তা মনে হয় আমাদের জিনের মধ্যে গ্রথিত হয়ে আছে শতাব্দীর পর শতাব্দী।

– এই তো তুমি অনুমান করলে জিনের মধ্যে। এটা কিরকম?

– হা হা হা! এটা অনুমান ঠিক ধরেছ। তবে এটা কথার কথা। গুরুত্ব দিয়ে নেয়ার কিছু নাই।

– কিন্তু এই অনুমানপ্রিয়তা কি অর্থহীন নয়?

– কেমন?

– ধরো তুমি জিজ্ঞেস করলে, বাইরে কি বৃষ্টি হচ্ছে? করিম

https://nagorikpathagar.org

উত্তর দিল, 'মনে হয় হচ্ছে' আর রহিম উত্তর দিল, 'মনে হয় হচ্ছে না'। দুজনেই অনুমান করেছে। আর আমরা এই রহিম এবং করিমের উত্তর থেকে জানলাম না আসলেই বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে কি না।

– বাহ! তুমি তো বেশ দার্শনিকের মতো প্রশ্ন করে ফেলেছ! কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে তুমি কোথায় এই অনুমান প্রয়োগ করবে। যেটা প্রত্যক্ষ করার উপায় আছে সেখানে তো তোমার অনুমান করা দরকার নেই। তাই না? রহিম এবং করিমের আলসেমির দায় তো দর্শন নেবে না। রহিম বা করিম বাইরে গিয়ে দেখে আসবে বৃষ্টি হচ্ছে, নাকি হচ্ছে না। কিন্তু ওই যে ধরো, আমি যদি বেলা চারটায় বাসায় আসি তাহলে আমি অনুমান করে নিই তুমি বাসায় থাকবে। কারণ তোমার স্কুল ছুটি হওয়ার পর তুমি ওই সময়ে বাসায় আসো।

– আচ্ছা। এর পরে কোনটা?

– এর পরে আছে শব্দ প্রমাণ। জ্ঞানী এবং ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষের মুখনিঃসৃত বাণীও সত্য। এবং তাদের কথা সত্য বলে ধরে নিতে হবে। এই হিসেবেই বেদ প্রমাণ।

– বাহ! জ্ঞানী ব্যক্তির মুখের কথাই প্রমাণ? এটা আবার কেমন কথা?

– কেন? তোমাকে যদি আইনস্টাইনের রেফারেন্স দেয়া হয় তাহলে তুমি মানবে না? পৃথিবীর তাবৎ গবেষণাপত্রে যে রেফারেন্স থাকে সেগুলো কী? জ্ঞানী ব্যক্তির লেখাই তো? সেই সময় তো আর লিখিত বই ছিল না, তাই জ্ঞানী ব্যক্তির কথাকে রেফারেন্স বা প্রমাণ হিসেবে ধরতে সমস্যা কোথায়? আছে সমস্যা?

https://nagorikpathagar.org

– না, তা অবশ্য নেই।

– তবে তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, দর্শনের এই প্রমাণ আর বিজ্ঞানের প্রমাণ এক নয়।

– আচ্ছা, মনে রাখবো। এরপর বলো, আর কী কী আছে?

– প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ এই তিনটি ভারতীয় দর্শনে প্রধান প্রমাণ। বাকি তিনটি – অর্থাৎ উপমান, অর্থাপাত্তি ও অনুপলব্ধি – অনুমানেরই বিভিন্ন রূপ। তবুও যেহেতু আলোচনায় এসেছে এসো দেখি সেগুলো কী।

প্রথমে উপমান। এটা কী? যদি শুনি যে গরুর মতো একটি বন্য জন্তু আছে যার নাম 'গবয়', আর কখনো যদি একটা জন্তু দেখি যা দেখতে গরুর মতো কিন্তু গরু নয়, তাহলে আমরা তাকে সহজে 'গবয়' বলে ধরে নেবো। এভাবে জ্ঞানপ্রাপ্তিকে বলে উপমান।

অর্থাপাত্তি, সেটা কী? ধরো করিমকে খুব হৃষ্টপুষ্ট এবং শক্তিমান দেখায় কিন্তু তাকে কেউ কখনো খেতে দেখেনি। তাহলে সে অগোচরে লুকিয়ে খায়। এই জ্ঞান অনিবার্য। এভাবে জ্ঞান অর্জনকে বলে অর্থাপাত্তি।

সর্বশেষ অনুপলব্ধি। এটা হচ্ছে, না দেখা থেকে না থাকার জ্ঞান। এটা একটু জটিল বলে মনে হতে পারে। আরও একটু খোলাসা করে বলি। আমি এখন ঘরে তোমার সাথে কথা বলছি, এবং এই ঘরে কোনো হাতি নেই। কারণ আমি কোনো হাতি দেখছি না। এটাই না দেখা থেকে না থাকার জ্ঞান। এর নাম 'অনুপলব্ধি'। এর আরো দুটি বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলোতে আমরা না আসি।

https://nagorikpathagar.org

– আচ্ছা বুঝলাম। এবার কি আমরা আলাদা আলাদা করে দর্শনগুলো কী কী সেটা দেখব?

– হুঁ, তবে আজ রাতে আবার। এখন নয়। প্রথমে আমরা জানব লোকায়ত বা চার্বাক দর্শন। তার আগে তোমাকে আরেকটা বিষয় বলে নিই সেটা হচ্ছে পুরুষার্থ। ভারতীয় দর্শনে পুরুষার্থ বা মানুষের জীবনের প্রধান চারটি লক্ষ্যের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এগুলো হলো ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ।

ধর্ম : জীবনের সঠিক পথ, 'নিজের ও সমাজের প্রতি ব্যক্তির কর্তব্য ও দায়িত্ব এবং ব্যক্তির প্রতি সমাজের কর্তব্য ও দায়িত্ব'কে ধর্ম বলা হয়েছে;

অর্থ : ব্যক্তির জীবন নির্বাহের জন্য উপযুক্ত জীবিকা;

কাম : আনন্দ ও বিনোদন;

মোক্ষ : মুক্তি।

https://nagorikpathagar.org

রাতে বাসায় ফিরে দেখি পুত্র তৈরি। আজকে চার্বাক দর্শন নিয়ে আলাপ করার কথা। রাতের খাবার সেরে পুত্রকে নিয়ে বসি।

– তোমার আগের কথাগুলো মনে থাকছে তো? নাকি ভুলে যাচ্ছ? আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করি।

– মোটেও না। সকালে তুমি ছয়টা প্রমাণের কথা বলেছ। প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপাত্তি, অনুপলব্ধি। ঠিক আছে না?

– হুঁ, একদম ঠিক। চার্বাকদের মতে একটা মাত্র প্রমাণই মান্য, সেটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যা দেখি না, শুনি না, স্পর্শ করতে পারি না, যার স্বাদ-গন্ধ পাই না – অর্থাৎ ইন্দ্রিয় যার কোনো জ্ঞান দেয় না, সেই জিনিস নেই। চার্বাকদের মতে ইন্দ্রিয় ছাড়া সত্য জানবার আর কোনো উপায় নেই। জগৎ সম্পর্কে চার্বাকেরা বলত, জগতের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই, কার্যকারণ নেই। আগুন, উষ্ণ, শীতল, বায়ু, সুখস্পর্শ এসব বিচিত্রতার কারণ-অন্বেষণ বৃথা। স্বভাব থেকেই এসব আপনাআপনি হয়।

https://nagorikpathagar.org

পৃথিবী, জল, তেজ, মরুৎ – এই চারটি ভূত; এগুলোই তত্ত্ব।

– দাঁড়াও দাঁড়াও। মরুৎ মানে কী, ভূত মানে কী? ঘোস্ট?

– না, মরুৎ মানে বায়ু; আর ভূত মানে মৌলিক পদার্থ।

– আচ্ছা।

– চার্বাকেরা মনে করত এই চারটি মৌলিক পদার্থের মিশ্রণেই দেহ উৎপন্ন হয়। মদের মধ্যে যেমন মাদকতা তৈরি হয় তেমনি এই চার ভূতের সংমিশ্রণে তৈরি দেহেও চৈতন্যের উদ্ভব হয়। ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল খুব চমকপ্রদ।

– কী ছিল তাদের ধারণা?

– তারা বলত লোকসিদ্ধ রাজাই পরমেশ্বর। তিনি তুষ্ট থাকলেই যথেষ্ট।

– বাহ। রাজাদের জন্য তো চার্বাকেরা খুব মজার কথা বলেছিল।

– হুঁ, সেটা বলেছিল। তবে সোজাসাপটা বলেছিল। আজকের যে রাষ্ট্র সে নিজেই ঈশ্বর হতে চায়। এটা আবার কার্ল মার্ক্স বলে গেছেন।

– চার্বাকদের দর্শন নিয়ে লেখা কোনো বই ছিল?

– ছিল হয়তো, কিন্তু সব কোনো না কোনোভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। চার্বাকদের গুরুর নাম ছিল বৃহস্পতি। এফ ডব্লিউ টমাস বলে এক সাহেব 'বৃহস্পতি সূত্র' বলে একটা বই গ্রন্থনা এবং সম্পাদনা করেন গত শতাব্দীর শুরুর দিকে। নাম দেখে মনে হতে পারে এটাই চার্বাকদের মূল বই, যেহেতু বইটা তাদের গুরুর নামে। কিন্তু বইটা পড়ে বিজ্ঞজনেরা মত দিয়েছেন এই

https://nagorikpathagar.org

বইয়ে চার্বাকদের মতের সামান্যই প্রভাব আছে।

– তাহলে চার্বাকদের মতবাদ আজ আমরা জানছি কীভাবে?

– এটা ভালো প্রশ্ন করেছ। আমরা জানি অন্যদের লেখা থেকে যারা চার্বাকের মতকে খণ্ডন করত। তারা চার্বাকেরা কী বলেছে সেটা উল্লেখ করে তারপরে তাদের মত খণ্ডন করত। এই প্রসঙ্গে একজন পণ্ডিতের খুব মজার মন্তব্য আছে। তিনি বলেছেন, 'এ সম্প্রদায়ের এমনই দুর্ভাগ্য যে একমাত্র বিপক্ষের রচনা থেকেই আমাদের পক্ষে একে বোঝবার চেষ্টা করা সম্ভব।' মাধবাচার্যের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বই আছে নাম 'সর্বদর্শন সংগ্রহ'। সেখানে প্রথম পরিচ্ছদের নাম 'লোকায়ত'। এটাকেই সবাই চার্বাক দর্শনের মূল রেফারেন্স হিসেবে মানে।

– তাহলে কি চার্বাকদের সব মত পাওয়া গেছে এটা বলা যাবে?

– না, সেটা অবশ্য বলা যাবে না। তবে চার্বাকদের নামে অনেক বদনাম ছড়িয়ে আছে। এটাই স্বাভাবিক। যখন তুমি শত্রুদের কাছে কারো সম্পর্কে জানবে তারা নিশ্চয় তাদের শত্রুদের সম্পর্কে ভালো কথা বলবে না।

– তা ঠিক। তবে বদনামগুলো কী?

– এগুলোর সাথে দর্শনের তেমন যোগ নেই। বেশিরভাগই গালাগালি। যেমন তারা নাকি বলত 'যতদিন বাঁচিবে সুখে থাকিতে চেষ্টা করিবে; প্রয়োজন হইলে ঋণ করিয়াও ঘি খাইবে।'

– হা হা হা হা! এটা বেশ মজার কথা। আর কী কী বদনাম আছে?

– চার্বাকেরা নাকি বলেছিল ভণ্ড, ধূর্ত ও নিশাচর এই তিন

https://nagorikpathagar.org

শ্রেণির লোক মিলে বেদ লিখেছে, যাতে প্রতারণা আর পশুবলিই প্রধান। ওরা নাকি কৌতুক করে বলত, যজ্ঞে নিহত পশু যদি স্বর্গে যায় তবে যারা যজ্ঞ করে তারা তাদের পিতামাতাকে যজ্ঞে বলি দেয় না কেন? দিলেই তো সহজে স্বর্গে যেতে পারত।

– হা হা হা হা! ওরা তো ভালোই যুক্তি দিতে পারত।

– হ্যাঁ, সেটা দিত, কিন্তু এগুলো কুযুক্তি। কীভাবে জানো? কারণ তারা তো যজ্ঞে পশু হত্যা করছে, যজ্ঞের বিধানও পশু বলি দেয়ার, যে-কোনো প্রাণী বলি দেয়া নয়। মানুষ যেহেতু পশু নয়, তাই যজ্ঞে মানুষ বলি দেবার কোনো সুযোগ নেই, তাই না?

– হুঁ, ঠিক।

– আর তাছাড়া যজ্ঞে উৎকৃষ্ট খাদ্য আহুতি দিতে হয়। পশুর মাংস, ঘি, সোমরস এগুলো উৎকৃষ্ট খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হতো। জন্যই সেগুলো আহুতি দেয়া হত। আর মানুষের মাংস তো মানুষের খাদ্য নয়। তাই নিজের বাবা-মাকে বলি দেয়ার যুক্তি একটা কুযুক্তি।

– আর স্বর্গে যাওয়ার বিষয়টা?

– আমি তোমাকে আগেই বলেছি ফিজিক্যাল বা ইহজগৎ আর নন-ফিজিক্যাল বা অধিবিদ্যক জগতের কথা। এটা যুক্তির বাইরের জগৎ। চার্বাকদের আরেকটা বিখ্যাত কৌতুক ছিল। মৃত মানুষের উদ্দেশে পিণ্ড দিলে যদি তার তৃপ্তি লাভ হয় তবে বিদেশে অবস্থান করা কারো উদ্দেশে পিণ্ড দিলে তার তৃপ্তি হবে না কেন?

– হা হা হা! তুমি বলবে এটাও কুযুক্তি?

https://nagorikpathagar.org

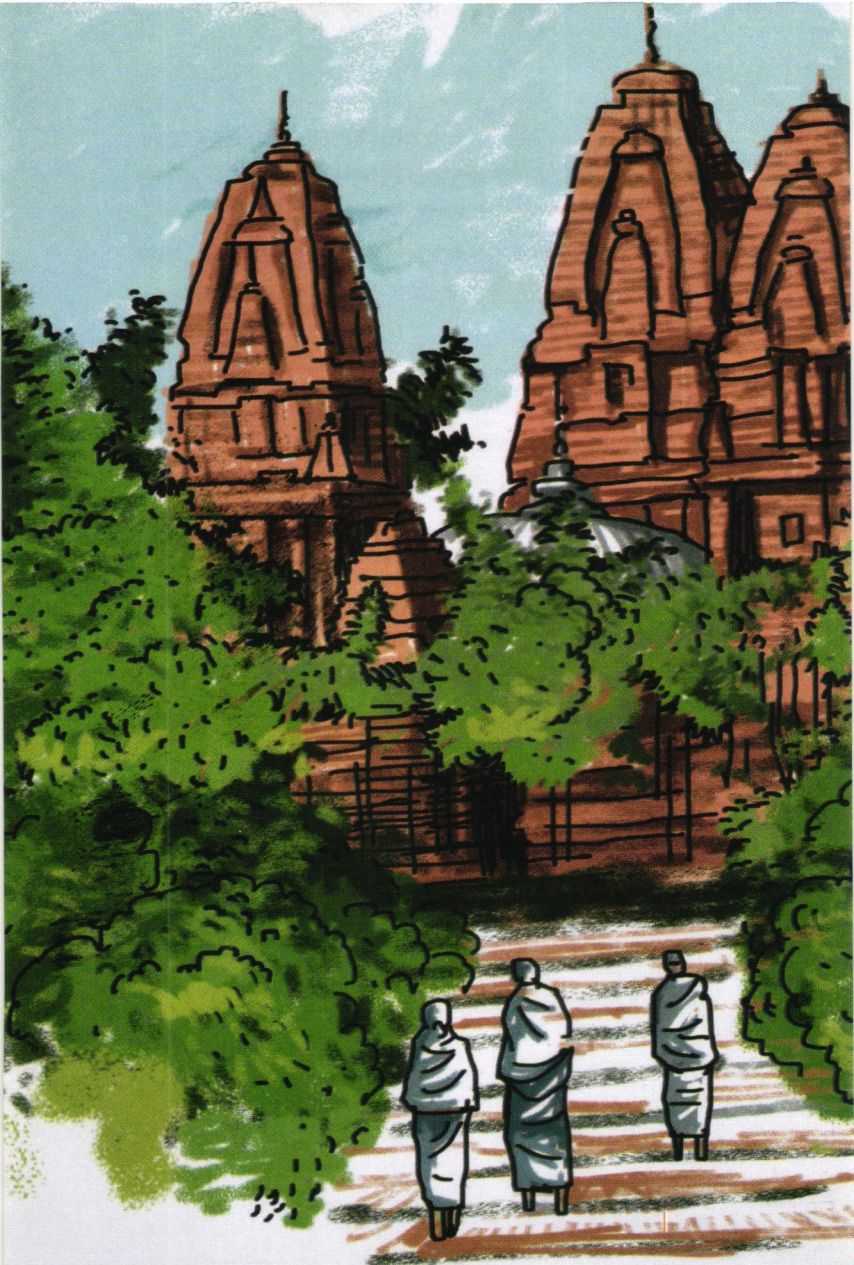

https://nagorikpathagar.org

– হ্যাঁ, কুযুক্তি তো বটেই। পিণ্ড দেয়া হচ্ছে এই ইহজগৎ থেকে অন্য কোনো অধিবিদ্যক জগতের উদ্দেশে। বিদেশে অবস্থানরত মানে তো এই ইহজগতেই আছে, সেখানে অধিবিদ্যক জগতের রীতিনীতিকে টেনে আনলে হবে? দুটো তো আলাদা। চার্বাকের বিরুদ্ধেও চার্বাক-বিরোধীদের এমন কৌতুককর যুক্তি আছে।

– তাই নাকি?

– হুঁ, তোমার তো মনে আছে, চার্বাকেরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া আর কিছু মানে না। তাই চার্বাক-বিরোধীরা বলত, চার্বাক চোখের আড়ালে গেলেই কি চার্বাকের বউ বিধবা হয়ে যায়?

– হা হা হা হা! উনারা তো দারুণ মজা করত? এটাও কি কুযুক্তি?

– হ্যাঁ, কুযুক্তি তো অবশ্যই। প্রত্যক্ষ মানে তো নিজে প্রত্যক্ষ করা নয় শুধু, অন্য কেউ প্রত্যক্ষ করলেও সেটা প্রত্যক্ষ।

– চার্বাকদের যুক্তির সাথে নাস্তিকদের যুক্তি খুব মেলে। তাই না?

– হ্যাঁ, ঠিক তাই। এই চিন্তায় খুব বেশি বৈচিত্র্য নেই। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সারা পৃথিবীতেও একই অবস্থা। চার্বাক দর্শন সম্পর্কে কিন্তু আলোচনা শেষ।

– এর পরে কোন দর্শন?

– এর পরে আরেক নাস্তিক-দর্শন জৈন দর্শন। তবে সেটা কালকে সকালে। আজ নয়।

https://nagorikpathagar.org

আজ ছুটি। সকালে আয়েশ করে ঘুম থেকে উঠে জম্পেশ করে নাশতা সারলাম বাপ-বেটা। এরপর চায়ের মগ হাতে নিয়ে বসলাম।

– আমার প্রথম বইয়ের বিক্রি নিয়ে খুব হতাশ হয়েছিলাম জানো?

– কেন বই বিক্রি হচ্ছিল না?

– উহুঁ। প্রত্যেকদিন প্রকাশককে ফোন করি। প্রকাশক উত্তর দেয়, না ভাই, বই যায়নি একটাও। একদিন প্রকাশক নিজে থেকেই ফোন দিল। ভাবলাম গালি-টালি আবার না দেয়।

– কেন? গালি দেবে কেন?

– বলতেই পারে, আপনার বই ছেপে দেউলিয়া হলাম। হা হা হা হা!

– তো উনি ফোন করে কী বললেন?

– উনি ফোনে যা বললেন তাতে তো আমি চমকে গেলাম।

https://nagorikpathagar.org

উনি বললেন, আপনার বই বিক্রি হচ্ছে। আমি দম বন্ধ করে জিজ্ঞেস করি, কয়টা হয়েছে। উনি নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে বললেন, মাত্র একটা। তবুও বউনি করলাম আর কি।

– হা হা হা হা! রসিক মানুষ তিনি। তুমি এটা আগেও বলেছিলে। আবারো কেন বললে?

– কারণ আছে; তবে এইটা আরেক ঘটনা। ওই ঘটনায় ফোন করেছিলাম। আর এবার প্রকাশক ফোন দিলেন। বউনিকে, মানে কোনো কিছুর সূচনাকে বগুড়ায় কী বলে জানো?

– কী বলে?

– বলে 'স্যাৎ'।

– স্যাৎ! এটা আবার কেমন কথা?

– এটা একটা দারুণ দার্শনিক কথা। 'স্যাৎ' বলতে তারা বোঝায় সম্ভাবনা তৈরি হলো। এই বিষয়েই আজকে আলাপ।

– মানে জৈন দর্শন?

– হুঁ। জৈন মানে জানো?

– না।

– জিন শব্দ থেকে জৈন শব্দটা এসেছে। 'জিন' মানে জয়ী। রাগ, দ্বেষ জয় করে যারা মুক্তিলাভ করেছে তারাই জিন। যারা জিন হবার পথ নিয়েছে তারাই জৈন। জৈন ঐতিহ্যে এইরকম চব্বিশজন মুক্ত পুরুষের কথা বলা আছে। তাদের বলা হয় তীর্থংকর। শেষ তীর্থংকর হচ্ছেন মহাবীর। এই মহাবীর ছিলেন গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক।

https://nagorikpathagar.org

– তাই নাকি? তাহলে তো জৈন ধর্ম অনেক প্রাচীন।

– হুঁ তাই। জৈন তীর্থঙ্করগণ অধিকাংশই ক্ষত্রিয়, মানে যোদ্ধা-সম্প্রদায়ের ছিলেন। তারা বেদ মানত না, ঈশ্বরও মানত না। তাদের বিশ্বাস, প্রত্যেক জীবই জিনদের পথ অনুসরণ করে বন্ধনমুক্ত হতে পারে। আর তারা প্রাকৃত, মানে সাধারণ মানুষের ভাষায় দর্শন-চর্চা করত বলে তা ব্যাপকসংখ্যক মানুষের নিকট পৌঁছাতে সক্ষম হয়। জৈনদের সম্পর্কে দুটো বেশ মজার তথ্য আছে।

– কী সেটা?

– মহাবীরের মৃত্যুর পরে জৈনদের সম্প্রদায় দুটি ভাগে ভাগ হয়। কীভাবে সেই ভাগ হয় জানো?

– কীভাবে?

– তারা কী পরিধান করে সেটা দিয়ে তাদের দুই মতকে আলাদা করা হতো।

– তাই? কী কী পরত তারা?

– একদল পরত শ্বেত বস্ত্র বা সাদা কাপড়। তাদের বলা হতো শ্বেতাম্বর। আর আরেক দল . . .।

– আরেক দল কী?

– হা হা হা হা! আরেক দল কিছু পরত না। তাদের বলা হতো দিগম্বর।

– বলো কী?

– হুঁ। তুমি ভারতবর্ষে ন্যাংটো সন্ন্যাসীদের একটা ঐতিহ্য আছে

https://nagorikpathagar.org

দেখতে পাবে। এটা এসেছে জৈন দিগম্বরদের প্রভাব থেকে।

– আশ্চর্য। আরেকটা মজার তথ্য কী?

– জাতিস্মর বিষয়টা জানো?

– না জানি না, কী এটা?

– যারা বিশ্বাস করে মানুষ যতদিন মুক্তি না পাবে ততদিন সে বারেবারে পৃথিবীতে জন্ম নেবে। একেকবার একেক জীবন লাভ করবে তার পূর্বজন্মের কর্মফলের ভিত্তিতে। যদি কর্ম ভালো হয় তাহলে একটা উন্নত জীবন পাবে, আর যদি সে ভালো কর্ম না করতে পারে তবে সে নীচু জীবন পাবে, এমনকি মানুষের জীবন না পেয়ে পশুর জীবনও পেতে পারে। মানুষ তার আগের জন্মের কথা মনে করতে পারে না। জৈনরা মনে করত মুক্ত মানুষ আগের জন্মের কথা মনে করতে পারে, তাই সকল তীর্থংকর ছিল জাতিস্মর। জাতিস্মর হচ্ছে তারাই যারা আগের জন্মের কথা মনে করতে পারে। এই জাতিস্মরের ধারণা জৈনদের কাছে থেকেই বৌদ্ধ আর হিন্দু ধর্মে এসেছে। সত্যজিৎ রায়ের একটা ফেলুদার উপন্যাস আছে জাতিস্মর নিয়ে, মনে আছে?

– হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে 'সোনার কেল্লা'। ওই যে বাচ্চা ছেলেটা জাতিস্মর; মুকুল নাম, যে বলে পূর্বজন্মের ইতিহাস তার মনে আছে। সে রাত জেগে ছবি আঁকে, যুদ্ধের, যেগুলো সে দেখেছিল পূর্বজন্মে।

– এই তো মনে পড়েছে। আরেকটা নতুন সিনেমা হয়েছে 'জাতিস্মর' নামে। সেখানে উনিশ শতকের পর্তুগিজ, যিনি বাংলা কবিগানের চর্চা করতেন সেই এন্টনি ফিরিঙ্গির পুনর্জন্ম

https://nagorikpathagar.org

https://nagorikpathagar.org

নিয়ে সিনেমাটা করা হয়েছে। যাই হোক, আমরা ফিরে আসি জৈনদের দর্শন নিয়ে।

– হুঁ, বলো।

– জৈন দর্শনের মূল কথা হলো, সাধারণ অভিজ্ঞতায় আমরা জগৎকে যেভাবে জানি তাই সত্য বা যথার্থ। এই জগতে বস্তুর অস্তিত্ব আছে, তাই কোনো এক বা অদ্বিতীয় পরমসত্তার কথা কল্পনা করা নিরর্থক। এই বস্তুসমূহকে দুভাগে ভাগ করা যায়, জীব ও অজীব। জীবন্ত প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই জীব বা আত্মা আছে – তার দেহ যেমনই হোক-না-কেন। সমস্ত জীবের প্রতি ঐকান্তিক অহিংসাই জৈন ধর্মের একটা মূল উপদেশ। ভারতবর্ষের অহিংসার মন্ত্র জৈনদের অবদান। দার্শনিক মত এবং জৈন যুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রেও জৈনদের এই অহিংস নীতির প্রভাব আছে। দার্শনিক তত্ত্ব বিচারে জৈনরা বিপক্ষ মতের প্রতি এক অদ্ভুত সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন।

– কী রকম সেটা?

– জৈনদের দর্শনের একটা মূল কথা হচ্ছে অনেকান্তবাদ। মানে সত্তা বহুমুখী, অতএব বিবিধভাবে তা বর্ণিত হতে পারে। তার মধ্যে কোন বর্ণনাই মিথ্যে নয়। আবার কোনো বর্ণনাই একমাত্র সত্য নয়। সত্তার বহুমুখী দিক সম্পর্কে সামগ্রিক উক্তি একমাত্র পূর্ণ জ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব। আমরা পূর্ণ জ্ঞানী নই। তাই প্রত্যেক বিষয়ে আমাদের প্রতিটি উক্তিই শেষ পর্যন্ত সম্ভাবনামূলক। এই সম্ভাবনার নির্দেশক শব্দ হচ্ছে 'স্যাৎ'। আমি তোমাকে আলাপের প্রথমেই বলেছিলাম বগুড়ায় দোকানে প্রথম বিক্রিকে বলে 'স্যাৎ' করা। তার মানে একটা সম্ভাবনা সৃষ্টি করা। জৈনদের তর্কবিদ্যার মূল কথা হচ্ছে 'স্যাৎবাদ'। জৈনরা 'আছে' বা 'নাই' বলবে না,

https://nagorikpathagar.org

বলবে 'স্যাৎ আছে' বা 'স্যাৎ নাই'। বিজ্ঞানের প্রবাবিলিটি বা সম্ভাব্যতার বিষয়টা জানো?

– না, বলো তো?

– বিজ্ঞানে যখন কোনো কিছু প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা হয় তখন একটা সম্ভাবনার সীমার মধ্যে বিষয়টাকে প্রকাশ করা হয়। যেমন ধরো, এই ওষুধ খেলে জ্বর সারবে। এটা ১০০% ক্ষেত্রেই সারবে না। বিজ্ঞান বলবে, এই ওষুধ খেলে জ্বর কমার সম্ভাবনা আছে এবং এই পর্যবেক্ষণ ৮০% ক্ষেত্রে সঠিক হবে। এটাই পরিসংখ্যানের ভাষা। আধুনিক পরিসংখ্যান জৈন দর্শন থেকে কিছু নিয়েছে কি না জানি না, তবে পশ্চিমের বহু আগে ভারতের চিন্তায় পরিসংখ্যানের 'সম্ভাবনা'র ধারণা ছিল।

– বাব্বাহ! আমরা তাহলে একদম বর্বর ছিলাম না, কী বলো!

– মোটেই না। হেগেল সাহেব বলেছিলেন, আমাদের নাকি ইতিহাস নেই। আমরা যদি নিজের কথা না জানি তাহলে মিলব কীভাবে সমানে সমানে? তুমি বাংলাদেশের পরিসংখ্যানবিদদের জিজ্ঞেস করে দেখো কে কে জৈন দর্শনের 'স্যাৎবাদ' জানে?

– হয়তো কেউই জানে না।

– কেউ কেউ হয়তো জানে, কিন্তু বগুড়ার বা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে একটা নিরক্ষর দোকানদারও 'স্যাৎ' জানে। হয়তো স্যাৎবাদ সে জানে না। আমাদের সমস্যাটা এই জায়গায়। যারা শিক্ষিত তারা তাদের মূল থেকে বিচ্ছিন্ন। আর যারা মাটির কাছাকাছি তারাই আমাদের ইতিহাস আর ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে। এই মাটির চিন্তা তুমি সেখানে গেলেই পাবে সবসময়।

https://nagorikpathagar.org

– আর একটা নাস্তিক-দর্শন বাকি থাকল। বলো তো কী?

– বৌদ্ধ দর্শন।

– হুঁ, ঠিক। ইন্টারেস্টিং বিষয় কী জানো? বুদ্ধ নিজে দর্শনচর্চা করেননি? বরং তিনি দর্শনচর্চার বিরোধীই ছিলেন?

– তাই নাকি! অবাক বিষয় তো!

– হুঁ, দর্শন সংক্রান্ত প্রশ্ন করলে তিনি নীরব থাকতেন। বৌদ্ধ ধর্মের মূল কথা অল্প। চারটি, এগুলোকে চার আর্য সত্য বলে। এক নম্বর সত্য হচ্ছে 'সকলই দুঃখ'। দুই নম্বর হচ্ছে, দুঃখের কারণ আছে। এই কারণের ব্যাখ্যায় তিনি প্রতীত্য-সমুৎপাদ নামে কার্যকারণের একটা সূত্র দিয়েছেন।

– কার্যকারণের সূত্র কী?

– এটাকে ইংরেজিতে বলে কজ অ্যান্ড ইফেক্ট। কোনো কাজ ঘটলে সেটার কারণ অনুসন্ধান করতে করতে মূল প্রশ্নে যাওয়া। ধরো, আমি যদি এখন তোমাকে প্রশ্ন করি, ঘরের মধ্যে এখন

https://nagorikpathagar.org

আলো কেন? তুমি হয়তো উত্তর দেবে, একটা বাল্ব জ্বলছে তাই। আবার যদি তখন প্রশ্ন করি, বাল্ব কেন জ্বলছে? তুমি হয়তো উত্তর দেবে, বিদ্যুৎ আছে তাই। আবার প্রশ্ন, বিদ্যুৎ কীভাবে আছে? উত্তর দেবে, টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয় তাই।

এভাবে অসংখ্য প্রশ্ন দিয়ে যে-কোনো ঘটনার মূলে আসা সম্ভব। যখন আর কোনো প্রশ্ন করা যায় না, সেটাকেই এরিস্টটল বলেছিলেন 'ফার্স্ট কজ'। এটাই ছিল এরিস্টটলের কার্য-কারণের সূত্র।

– আচ্ছা। চার আর্য সত্যের মধ্যে তো দুইটা বললে, অন্য দুই সত্য কী কী ছিল?

– তিন নম্বর হচ্ছে, যে দুঃখের কথা বলা হচ্ছে সেই দুঃখের নিরোধ সম্ভব। আর চার নম্বর আর্য সত্য হচ্ছে এই দুঃখ নিরোধের সুনির্দিষ্ট পথ বা মার্গ বা উপায় আছে।

– কয়টা মার্গ আছে?

– আটটা মার্গ। তাই এটাকে বলে অষ্টাঙ্গিক মার্গ। অষ্টাঙ্গিক মার্গের আটটি উপদেশকে সম্যক প্রজ্ঞা, সম্যক শীল ও সম্যক সমাধি এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

সম্যক প্রজ্ঞা দুই প্রকার – সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সঙ্কল্প। কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্মের সঠিক জ্ঞানকে সম্যক দৃষ্টি বলে। অহিংসা, চুরি না করা, ব্যভিচার না করা ও সত্যভাষণ হলো কায়িক সুকর্ম। নিন্দা না করা, মধুর ভাষণ ও লোভহীনতা হলো বাচনিক সম্যক সংকল্প। এবং মিথ্যা ধারণা না করা ও প্রতিহিংসাপরায়ণ না হওয়া হলো মানসিক সম্যক সংকল্প।

https://nagorikpathagar.org

সম্যক শীল তিন প্রকার – সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম ও সম্যক জীবিকা। মিথ্যা কথা, পরনিন্দা, কটুবাক্য ও অতিকথন ত্যাগ করে সত্যভাষণ ও মধুর বচনকে সম্যক বাক্য বলে। অহিংসা, চুরি না করা, ব্যভিচার না করাকে সম্যক কর্ম এবং অসৎ পন্থা ত্যাগকে সম্যক জীবিকা বলে। গৌতম বুদ্ধ অস্ত্র-ব্যবসা, প্রাণী-ব্যবসা, মাংস বিক্রয় এবং মদ ও বিষের বাণিজ্যকে মিথ্যা জীবিকা বলে উল্লেখ করেছেন।

সম্যক সমাধি তিন প্রকার – সম্যক প্রযত্ন, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ব্যায়াম, ইন্দ্রিয় সংযম, কুচিন্তা ত্যাগ এবং সৎ চিন্তার চেষ্টা ও তাকে স্থায়ী করার চেষ্টা হচ্ছে সম্যক প্রযত্ন। কায়া, বেদনা, চিত্ত ও মনের ধর্মের সঠিক স্থিতিসমূহ ও তাদের ক্ষণবিধ্বংসী চরিত্রকে সদা স্মরণে রাখাকে সম্যক স্মৃতি এবং চিত্তের একাগ্রতাকে সম্যক সমাধি বলে।

– বাব্বাহ, বিশাল তালিকা তো!

– উহুঁ, তালিকা হিসেবে বিশাল নয়। বরং এই কয়েক লাইনের মধ্যেই একটা মহান ধর্মকে ধারণ করা হয়েছে।

– দর্শন কোথায় এর মধ্যে?

– আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি, দর্শন এসেছে পরে। বুদ্ধের মৃত্যুর পরে চারটি দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। একটা হচ্ছে বৈভাষিক সম্প্রদায়, যারা বলেন অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ উভয়ের অস্তিত্ব আছে এবং প্রত্যক্ষভাবেই সেই বহির্জগতের জ্ঞান হয়। এর পরে আছে সৌতান্ত্রিক সম্প্রদায় তাদের মতেও অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ উভয়ের অস্তিত্ব আছে কিন্তু প্রত্যক্ষভাবেই সেই বহির্জগতের জ্ঞান হয় না। বহির্জগতের একটা মানসিক ছবি তৈরি করে আমরা সেই বহির্জগতের সত্তা অনুমান

https://nagorikpathagar.org

করতে পারি। এর পরে আছে যোগাচার সম্প্রদায়। এরা বলে বহির্জগতের কোনো অস্তিত্ব নেই, একমাত্র মনই সত্য এবং তথাকথিত বহির্জগৎ আসলে মনের ধারণা, মনগড়া। এটার সাথে হিন্দুদের মায়াবাদের মিল আছে। আমরা সেটাও জানব। আর শেষ সম্প্রদায় হচ্ছে মাধ্যমিক সম্প্রদায়, এদের আরেক নাম আছে শূন্যবাদ। এরা মনে করে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ কোনকিছুরই প্রকৃত সত্তা নেই – সবই শূন্য, শূন্যই চরম সত্য।

– সবই শূন্য? এটার মানে কী?

– হা হা হা! সাধারণত শূন্যবাদ বলতে সংসারকে শূন্যময় বুঝিয়ে থাকে। কোনো বস্তুর অস্তিত্ব না থাকাকেই 'শূন্য' বলা হয়। কিন্তু এটি হচ্ছে শূন্য শব্দের আভিধানিক অর্থ। মাধ্যমিক দর্শনের শূন্যবাদে 'শূন্য' শব্দটি পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। শূন্যের অর্থ মাধ্যমিকের মতে শূন্যতা নয়, তার বিপরীত। শূন্যের অর্থ বর্ণনাতীত। পরমতত্ত্ব অবর্ণনীয়। মানুষের বস্তু-অস্তিত্ব প্রতীত হয়, কিন্তু যখন সে তার তাত্ত্বিক স্বরূপ জানতে প্রয়াসী হয় তখন তার বুদ্ধি কাজ করে না। সে নিশ্চয় করতে পারে না যে, বস্তুর যথার্থ স্বরূপটি কী? এটার সাথে শ্রী চৈতন্যের অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের মিল আছে।

– বৌদ্ধ দর্শন কি তাহলে শেষ?

– হুঁ, আপাতত। আমরা কাল শুরু করব আস্তিক দর্শনগুলো। তবে মনে রাখবো দর্শন আলোচনায় আস্তিক মানে, যারা বেদ মানে।

https://nagorikpathagar.org

https://nagorikpathagar.org

সকালে পত্রিকা সহযোগে চা পানের সময় আবার পুত্রের আগমন। দর্শন মোটামুটি তার পছন্দের আর আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠেছে বুঝতে পারছি।

– তুমি পেপার পড়ো কেন প্রত্যেকদিন?

– এটা অভ্যাস। দেশের বাইরে গেলে, এমনকি ঢাকার বাইরে গেলেও আমার দৈনিক পত্রিকা পড়ার ইচ্ছাই হয় না। অদ্ভুত বিষয় বটে। তোমার সাথে তো নাস্তিক দর্শনের আলাপ শেষ হয়েছে। এবার আস্তিক দর্শনের পালা।

– আচ্ছা শুরু করো। আস্তিক দর্শন কোনটা প্রথমে?

– কয়টা আস্তিক দর্শন মনে আছে তো?

– হুঁ। আস্তিক দর্শন ছয়টা : সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব-মীমাংসা বা মীমাংসা, উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত।

– একদম ঠিক। অনেকে মনে করেন সাংখ্য দর্শন বাঙলায় উৎপত্তি হয়ে থাকতে পারে। মানে এটা বাঙলার নিজস্ব দর্শন।

https://nagorikpathagar.org

– তাই নাকি! কীভাবে?

– ১৬ শতাব্দীতে বাঙালি দার্শনিক বিজ্ঞান ভিক্ষুর সাংখ্য সূত্রের ভাষ্য আছে। তবে বিজ্ঞান ভিক্ষুর ভাষ্য রচনাই এর একমাত্র কারণ নয়, আরো কিছু কারণ আছে যার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

– সেই কারণগুলো কী কী?

– সাংখ্য দর্শনের প্রবর্তক কপিল ঋষি। কপিল শব্দের অর্থ তামাটে। সাংখ্য দর্শনের আরো অন্যান্য দার্শনিকের নাম হচ্ছে আসুরি, পঞ্চশিখ, সনন্দ। আসুরি শব্দটা 'অসুর' থেকে আসতে পারে, যা সাংখ্য দর্শনের অনার্য উৎপত্তিকে নির্দেশ করে। এ ছাড়াও বাঙালি হিন্দুদের তর্পণ-বিধিতে সাংখ্য দার্শনিকদের তর্পণের ব্যবস্থা আছে, যা বাঙালি ভিন্ন অন্য হিন্দু সম্প্রদায়ে নেই। যেমন,

> সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতন;
> কপিলশ্চসুরিচৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা;
> সর্বে তে তৃপ্তিমায়ান্ত মদ্দেত্তেনাম্বুনা সদা।

– এর মানে কী?

– এর মানে সনন্দ, কপিল মুনিকে, আট পঞ্চ শিখকে স্মরণ করে তর্পণ করছি। উনারা তৃপ্তি লাভ করুন। কার্য-কারণ বা কজ এন্ড ইফেক্ট সম্পর্কে সাংখ্য দর্শনে একটি সুনির্দিষ্ট মত আছে; তার নাম সৎকার্যবাদ বা পরিণামবাদ। এই মত অনুসারে কার্য একান্তভাবেই কারণের পরিণাম; কার্যের মধ্যে এমন কিছু থাকতে পারে না যা কারণের মধ্যে বীজাকারে অস্ফুটভাবে ছিল না। আমরা যে জগৎকে দেখি তা আসলে কার্য এবং তা জড় রূপ। এই কার্যের মধ্যে যে কারণ-রূপ জগৎ, সেটাকে সাংখ্য

https://nagorikpathagar.org

দর্শনে প্রকৃতি বলা হয়। প্রকৃতির উপাদান তিনটি। সত্ত্ব, তমঃ ও রজঃ। প্রকৃতির মধ্যেই জগতের সকল উপাদান। অর্থাৎ যখন এই তিনটি গুণ কোনো বিক্ষোভ সৃষ্টি না করে সমানভাবে অবস্থান করে তার নামই 'প্রকৃতি'।

– কঠিন বিষয় মনে হচ্ছে। সত্ত্ব, তমঃ, রজঃ এগুলো কী?

– সত্ত্ব বলতে বোঝায় স্থিরতা, সৌন্দর্য, ঔজ্জ্বল্য ও আনন্দ; রজঃ হচ্ছে গতি, ক্রিয়াশীলতা, উচ্ছ্বাস ও যন্ত্রণা; আর তমঃ হচ্ছে সমাপ্তি, কঠোরতা, ভার, ধ্বংস ও আলস্য।

এগুলোকে আমরা গুণ বলতে পারি। প্রকৃতি সত্ত্ব, তমঃ ও রজঃ এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থা থেকে বিচ্যুত হলে দৃশ্যমান স্থূল জগতের উদ্ভব হয়। সাংখ্য দর্শনে পুরুষ বলে আরেকটি প্রধান ধারণা আছে? পুরুষ বলতে চেতন আত্মা বা Soul বুঝায়।
– আচ্ছা।

– প্রকৃতি সাম্যাবস্থায় নিষ্ক্রিয়, অচেতন ও জড়। পাশ্চাত্য দর্শন মতে এটাই বস্তু জগৎ। প্রকৃতি পুরুষের সংস্পর্শে এসে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তোমাকে আগেই বলেছি এই পুরুষ হচ্ছে পাশ্চাত্য দর্শনের 'ভাব' বা 'চৈতন্য'। ভাবের সংস্পর্শে প্রকৃতির সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়, প্রকৃতি প্রাণ পায়।

– তাহলে ভাব আর বস্তুর মিলনেই জগতের সৃষ্টি?

– একদম ঠিক। এই চৈতন্য বা ভাব বা পুরুষ যখন প্রকৃতিকে জানতে পারে তখনি চৈতন্যের মুক্তি।

– চৈতন্যের মুক্তি কেন? এটার মানে কী?

– জগৎকে জানলো। তার জ্ঞান হলো। তাই।

https://nagorikpathagar.org

– ও আচ্ছা।

– আরেকটা বিষয় আছে সেটাও মন দিয়ে শোনা দরকার। বিষয়টা জটিল লাগতে পারে।

– আচ্ছা বলো।

– ভাবের দিক থেকে বস্তুকে দেখা বা পুরুষের দিক থেকে প্রকৃতিকে দেখা বা প্রকৃতির দিক থেকে পুরুষকে দেখার কারণেই দর্শকের চোখে জগৎ কখনো পুরুষ হিসেবে আর কখনো প্রকৃতি হিসেবে দেখা দেয়। এটাই বস্তু ও ভাবের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে সাংখ্য দর্শন 'লীলা' বলে।

– বড্ড কঠিন, বুঝলাম না।

– হা হা হা! আচ্ছা ধরো, তুমি আমাকে দেখছ। দেখছ বাবা সামনে বসে আছে। শুধু আমি বসে আছি তাই না? তুমি যদি আমার ভিতরে ঢুকে যেতে পারতে তাহলে তুমি আমার মধ্যে থেকেই তোমাকে দেখতে? তাহলে ঘরে দ্বিতীয় মানুষ হিসেবে তোমাকে দেখতে পেতে তাই না?

– হুঁ, তাই।

– সেভাবেই তুমি যদি প্রকৃতির দিক থেকে জগৎকে দেখো তাহলে তুমি শুধু চৈতন্য দেখবে। প্রকৃতিকে তো তুমি আলাদা করে দেখবে না, তুমি তো ওর মধ্যেই বসে আছো। আর যদি পুরুষের মধ্যে বসে জগৎকে দেখো তাহলে তুমি শুধু বস্তুজগৎকে বা প্রকৃতিকে দেখবে। তাহলে তোমার সামনে জগৎ একবার পুরুষ হয়ে দেখা দিচ্ছে, আরেকবার প্রকৃতি হয়ে দেখা দিচ্ছে। তাই না?

– হুঁ, আমি অবস্থান বদল করলে তাই হচ্ছে।

https://nagorikpathagar.org

– এই দুইভাবে দেখা দেয়ার নামই লীলা।

– ও তাহলে লীলা মানে লীলাখেলা নয়?

– না, দার্শনিকভাবে নয়। প্রকৃতি ও পুরুষের ধারণাই পশ্চিমে 'বস্তু' আর 'ভাব' হিসেবে বিকশিত হয়েছে। ভাব ও বস্তুর যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক ইউরোপীয় দার্শনিকেরা চিন্তা করেছেন ভারতবর্ষে সেটাই 'লীলা' বলে পরিচিত।

– দ্বান্দ্বিক মানে আবার কী?

– ঠিকই ধরেছ। এটা তোমাকে বলা হয়নি। দ্বান্দ্বিক মানে দুইয়ের দ্বন্দ্ব। সেটা কী রকম আমি বলি। ধরো একটা ফুল ফুটছে। এটাকে তুমি দেখছ আস্তে আস্তে ফুলটা ফুটে উঠছে পরিপূর্ণভাবে। আবার তুমি চিন্তা করলে দেখতে পেতে, এই ফুলটা যতই বিকশিত হচ্ছে ততই সে তার বিনাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই দুইটা একদম বিপরীত নয় কি?

– হুঁ, ঠিক একভাবে ভাবলে ফুলটা বিকশিত হচ্ছে, আরেকভাবে ভাবলে ফুলটা মরণের দিকে যাচ্ছে।

– একদম ঠিক। তাহলে এই দুই বিপরীতের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটাই দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের মধ্য দিয়েই ফুলের জীবনের পরিপূর্ণতা ঘটছে। ঠিক একইভাবে ভাব-জগৎ আর বস্তু-জগতের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক আছে। এখানে নোক্তা দিয়ে রাখো, পরে সময় পেলে ইউরোপীয় দর্শন আলোচনার সময় এটা জানব।

– চৈতন্যকে ভারতীয় দর্শনে পুরুষ বলে, তাহলে প্রকৃতিকে স্ত্রী বলে না কেন?

– প্রকৃতি শব্দটা সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী স্ত্রীবাচক। প্রকৃতিকে

https://nagorikpathagar.org

তাই কোথাও লজ্জাশীলা বধূ, কোথাও নর্তকী হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। সাংখ্য দর্শন হলেও এই দর্শনের পুরুষ ও প্রকৃতি উপমা নারী আর পুরুষের প্রেম, অপ্রেম আর লীলা কাব্যেও রূপ পেয়েছে। পুরুষ-প্রকৃতির সম্পর্ককে নর-নারীর সনাতন সম্পর্কের রূপক হিসেবেই দেখা হয়েছে। দর্শন থেকে কাব্যের এমন মনোহর উত্তরণ পশ্চিমে হয়নি। আমরা অবশ্য কাব্য ধরে দর্শন ভুলে গেছি। রাধা আর কৃষ্ণ বাঙলার ভাবচর্চায় সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি আর পুরুষের প্রতীক। রাধা হচ্ছে প্রকৃতি আর কৃষ্ণ হচ্ছে পুরুষ। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম হচ্ছে লীলা, যা প্রতীকায়িত করেছে বস্তু আর ভাবের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে।

– ও তাহলে রাধা-কৃষ্ণকে এখন থেকে প্রকৃতি আর পুরুষ হিসেবে জানতে হবে।

– ঠিক তাই, তাহলে অনেক বিষয় পরিষ্কার হয়ে যাবে দেখবে। সাংখ্য দর্শন মতে বস্তুর লোপ নেই, নতুন বস্তুর আবির্ভাব নেই; আছে শুধু বস্তুর অবস্থান্তর প্রাপ্তি। এটাই বস্তুর অবিনাশী তত্ত্ব। ল্যাভয়সিয়ের বস্তুর অবস্থান্তর তত্ত্ব, জোসেফ প্রুস্তের ডেফিনিট প্রপোরশন আর ডালটনের পরমাণু তত্ত্ব এই বস্তুর অবিনাশী তত্ত্বের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। ভারতবর্ষের যোগীরা অতীত ও অনাগতকে প্রত্যক্ষ করেন বলে কথিত ছিল। এই সম্ভাবনা এই অবিনাশী তত্ত্বেই লুকিয়ে আছে। দুধে দইয়ের সম্ভাবনা আছে; আর যে অঙ্কুর বৃক্ষে পরিণত হয়েছে সেই অঙ্কুর একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। তাই বস্তুর পরিণাম বা অবস্থান্তর প্রাপ্তি যিনি জানেন তিনি অতীত ও অনাগতকে বর্তমানের মতো প্রত্যক্ষ করতে পারেন। কার্যে বিলীন হওয়া কারণ ও কারণে যে কার্য ব্যাক্ত হয় না সেই দুটোকেই প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বর নেই। কারণ জগৎ-প্রপঞ্চ ব্যাখ্যায় প্রকৃতি আর পুরুষই

https://nagorikpathagar.org

যথেষ্ট। ধারণা করা যায় এ কারণেই বেদের প্রামাণ্য মানলেও সাংখ্য দর্শনকে বেদান্তবাদীদের আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছে।

– সাংখ্য ঈশ্বর মানে না, তাও তারা নাস্তিক নয়?

– না নয়। আমি তো আগেই বলেছি তোমাকে, নাস্তিক-আস্তিক বিষয়টা ভারতীয় দর্শনে আলাদা। তোমাকে ভাব আর বস্তুর দ্বন্দ্বের যে কথা বলেছি সেটা একটা চমৎকার কীর্তনে আছে।

– কীর্তনে দর্শন!

– হ্যাঁ, থাকতেই পারে। লোপামুদ্রা মিত্রের কণ্ঠে একটা অপূর্ব কীর্তন আছে। পুরো কীর্তনটা এই রকম।

বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের।
রাই আমাদের রাই আমাদের,
আমরা রাইয়ের, শ্যাম তোমাদের, রাই আমাদের।
বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদন মোহন।
আহা শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদন মোহন।
আর সারী বলে,
আমার রাধা বামে যতক্ষণ নইলে শুধুই মদন।
বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের।
শুক বলে আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে।
আহা শুক বলে আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে।
আর সারী বলে, আমার রাধার চরণ পাবে বলে,
চূড়া তাইতো হেলে।
বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের।
শুক বলে আমার কৃষ্ণের মাথায় শিখির পাখা।
আহা শুক বলে আমার কৃষ্ণের মাথায় শিখির পাখা।
আর সারী বলে,

https://nagorikpathagar.org

আমার রাধার নামটি তাতে লেখা,
সে যে যায় না দেখা।
বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের।
শুক সারী দুজনার দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল।
আহা শুক সারী দুজনার দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল।
রাধা কৃষ্ণের নামে এবার হরি হরি বলো,
বৃন্দাবনে চলো।

শুক আর সারীর তর্কের মেটাফর বা রূপকে এক অসামান্য দার্শনিক প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে অসাধারণ মুন্সিয়ানায়। যেই দার্শনিক তর্কের উত্তর পেতে ইউরোপকে মার্ক্সের আবির্ভাব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে।

– ভাব আর বস্তুর এই দ্বন্দ্বের ফয়সালা কি মার্ক্স করেছেন?

– হ্যাঁ, ঠিক তাই। আঠারো শতকে। কিন্তু সেই তর্ক আরো অনেক আগেই উঠেছিল ভারতে। ফয়সালাও হয়েছিল অনেক অনেক আগেই। এই গানে শুক হচ্ছে 'ভাব'রূপী চৈতন্যের প্রতিনিধি, আর সারী হচ্ছে বস্তু-জগতের প্রতিনিধি। এই দুজন তর্ক করছে কে শ্রেষ্ঠ? প্রকৃতিরূপী রাধা, নাকি চৈতন্যরূপী কৃষ্ণ? তোমাকে আগেই বলেছি বাঙলার ভাব-দর্শনে কৃষ্ণ ভগবান, মানে পুরুষ; আর রাধা প্রকৃতি। রাধা আর কৃষ্ণও মেটাফর বা রূপক। সাংখ্য দর্শন অনুসারে 'পুরুষ' হচ্ছে কৃষ্ণ আর 'প্রকৃতি' হচ্ছে রাধা। পুরুষ হচ্ছে চৈতন্য বা চেতনা, আর প্রকৃতি হচ্ছে বস্তু বা বিশ্ব প্রকৃতি। দ্রষ্টার কাছে পুরুষ যখন কর্তা-সত্তা হিসেবে আবির্ভূত হন তখন প্রকৃতি হয়ে যায় তার অধীন।

– কর্তাসত্তা আবার কী?

– এটা কিন্তু বোঝা সহজ। এর মানে হচ্ছে, হু ইজ ইন কমান্ড?

https://nagorikpathagar.org

পুরুষ কমান্ডে, নাকি প্রকৃতি কমান্ডে? তুমি তো আগেই দেখছ, প্রকৃতি নিষ্ক্রিয়। তাহলে প্রকৃতি কমান্ডে নেই। বুঝেছ?

– হুঁ, বুঝলাম।

– এই পুরুষ আর প্রকৃতির সম্পর্ক সপ্রাণ এবং দ্বান্দ্বিক। আমরা সবাই রাধা। তাই শ্রী চৈতন্য অন্তরে কৃষ্ণকে নিয়ে বহিরঙ্গে রাধা হয়ে কৃষ্ণের সাথে মিলনের জন্য সাধনা করেছেন। বাঙলায় কৃষ্ণ রাধার সাথে মিলিত হতে চায়। কৃষ্ণ ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে প্রান্তে চলে আসেন সৃষ্টির সাথে মিলনের আকাঙ্ক্ষায়। ফরাসি দার্শনিক দেরিদার ভাষায় স্রষ্টার অবিনির্মাণ ডিকনস্ট্রাকশন ঘটে। উপেক্ষিত প্রকৃতি রাধার প্রতিমূর্তি হয়ে স্রষ্টার সাথে প্রেমময় মিলনে মুক্তি পায়। ভাব আর বস্তু একাকার হয়ে যায়। শুক যখন বলে 'আমার কৃষ্ণ মদন মোহন', সারী তখন বলে 'রাধা আছে জন্যই সে মদনমোহন'। নইলে কৃষ্ণ কে? রাধা ছাড়া একা সে তো শুধুই 'মদন'। বাক্য গঠন ও শব্দ চয়ন লক্ষ করো। কী অসাধারণ মুন্সিয়ানায় ভগবানরূপী কৃষ্ণকে 'মদন' বলা হলো।

– হা হা হা হা! ভগবানকে মদন বলাটা দুঃসাহস।

– সেটা তো বটেই। কিন্তু তা হয়েছে অনেক আগেই। কেউ কিন্তু এই কীর্তন নিয়ে কোনো অভিযোগ করেনি। এমনকি ধর্মবাদীরাও করেনি। তোমাকে তো বলেছি ইউরোপের দর্শনে পুরুষ, নাকি প্রকৃতি কর্তা – এটাই ছিল দর্শনের জগতের এক মূল প্রশ্ন।

– আমরা যেটাকে ভাববাদ আর বস্তুবাদের ঐতিহাসিক ঝগড়া বলে জানি।

https://nagorikpathagar.org

– হুঁ, ঠিক বলেছ, ঝগড়া। এই দ্বন্দ্ব বাঙলা কীভাবে ফয়সালা করল? কীর্তনের শেষ অংশটা দেখো। বাঙলা বলছে 'রাধা কৃষ্ণের নামে এবার হরি হরি বলো'। রাধা আর কৃষ্ণ আলাদা নয়, একসাথে দুজনে মিলেই 'হরি', মানে সেই পরম। ভাব বস্তুতে বিলীন হয়, সেই সত্য। এককভাবে কেউ সত্য নয়, এই যুগল উপস্থিতিই সত্য। এবার কীর্তনটা শোনো। নতুন আলোয় ধরা দেবে এই গান আরেকবার। আমি অফিসে যাই।

গান বাজিয়ে দিয়ে আমি অফিসের জন্য তৈরি হতে থাকি।

https://nagorikpathagar.org

সন্ধ্যায় বাসায় ফিরেই দেখি পুত্র গুনগুন করে গাইছে 'বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের। রাই আমাদের রাই আমাদের, আমরা রাইয়ের, শ্যাম তোমাদের, রাই আমাদের . . .।' বুঝলাম রাধা কৃষ্ণ আর সাংখ্য দর্শন পুত্রের মাথায় বেশ ভালোভাবেই ঢুকেছে।

– আর কী কী বাকি আছে, বলো। আমি পুত্রের কাছে জানতে চাই।

– ষড় দর্শন, মানে ছয়টার তো একটা মাত্র হলো। আরো তো পাঁচটা বাকি?

– কী কী?

– যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক আর পূর্ব ও উত্তর মীমাংসা। ঠিক আছে না?

– হুঁ, একদম ঠিক। এবার যোগ দর্শন?

– আচ্ছা দাঁড়াও। এই যোগ দর্শনই কী যোগ ব্যায়াম?

https://nagorikpathagar.org

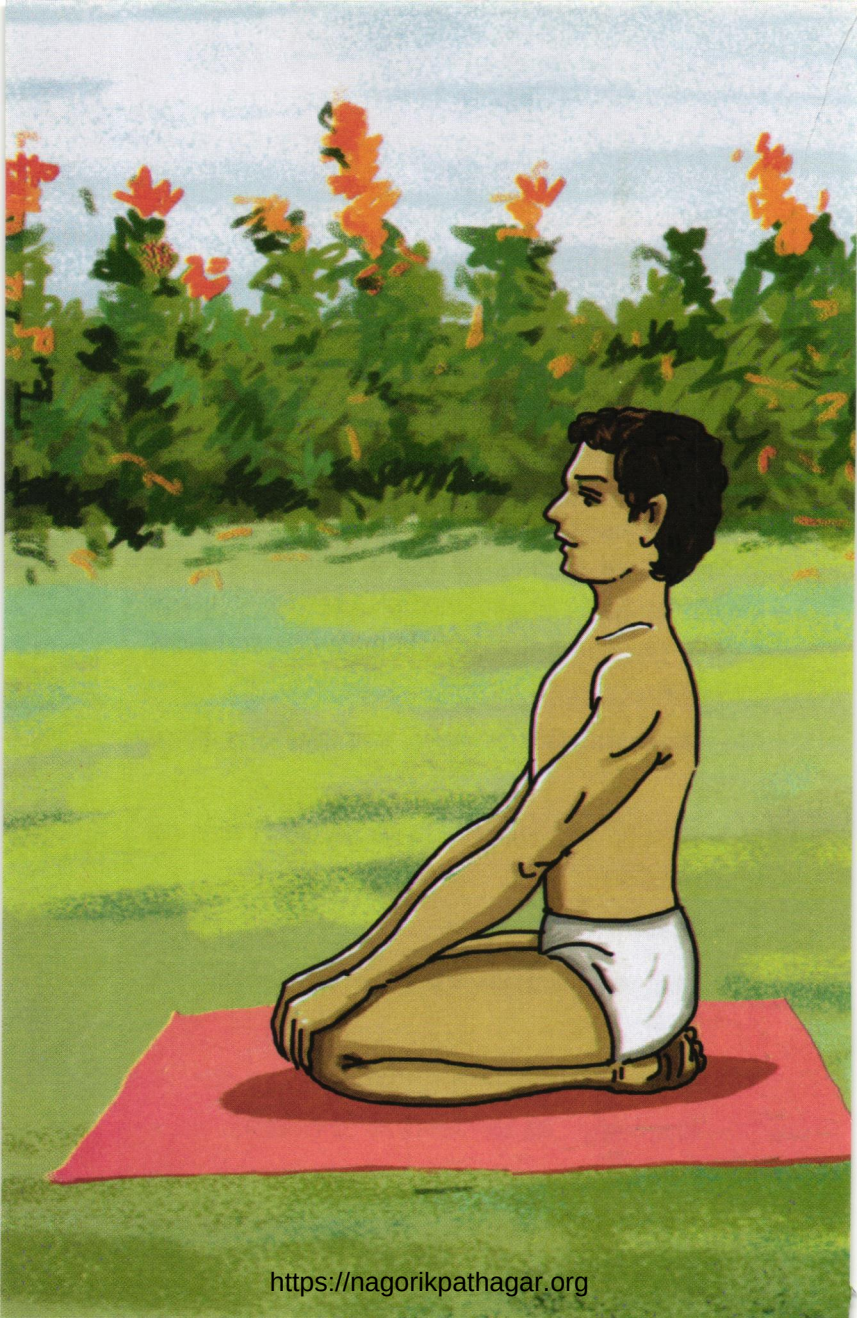

https://nagorikpathagar.org

– বলতে পারো যে এই যোগ দর্শন থেকেই যোগ ব্যায়ামের উৎপত্তি। যোগ দর্শন হলো প্রধানত সাধনশাস্ত্র ও প্রয়োগবিদ্যা। যোগমতে প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান বা বিবেকখ্যাতি হলো কৈবল্য লাভ বা মুক্তিলাভের উপায়। বিবেকখ্যাতির অর্থ হলো পুরুষ বা আত্মা দেহ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার থেকে পৃথক শুদ্ধ চৈতন্য সত্তা। এই বিবেকখ্যাতির জন্য প্রয়োজন চিত্তবৃত্তির নিরোধ। যোগশাস্ত্র অনুযায়ী চিত্তবৃত্তি নিরোধের দুটি প্রধান উপায় হলো অভ্যাস ও বৈরাগ্য। বৈরাগ্যের দ্বারা বিষয়ে বৈরাগ্য আসে এবং অভ্যাসের দ্বারা বিবেক-জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

– দর্শনের মধ্যে আবার ব্যায়াম ঢুকে পড়ে কেন?

– কেন, তোমাকে তো আগেই বলেছি ভারতবর্ষে দর্শনের সাথে অন্যান্য জ্ঞানের ছেদ ঘটেনি। তাই সব জ্ঞান জড়াজড়ি করে আছে। যোগ দর্শন ঠিক পুরোপুরি দর্শন নয়। যোগ দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় দর্শন নয়। চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ বা সমাধি। আর ওই যে বলেছি অভ্যাসের দ্বারা বিবেক-জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। তাই বিবেক-জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য ব্যায়াম।

– চিত্ত কী? চিত্তবৃত্তির নিরোধই বা কী?

– হা হা হা! আমি জানি এই প্রশ্ন তুমি করবে। যোগ দর্শনের রচয়িতা মহর্ষি পতঞ্জলি ও ভাষ্যকার ব্যাসদেব বুদ্ধি ও মনকে চিত্ত বলেছেন। প্রকৃতির কতকগুলি বিকারকে একসাথে চিত্ত বলা হয়। সাংখ্যমতে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির প্রথম বিকার হলো মহৎ। মহতের বিকার বুদ্ধি এবং বুদ্ধির বিকার অহঙ্কার। আর অহঙ্কারের অন্যতম বিকার হলো মন। এগুলিকে একসঙ্গে সাংখ্য দর্শনে চিত্ত বলা হয়। সাংখ্যের এই মত যোগ দর্শনেও

https://nagorikpathagar.org

স্বীকৃত হয়েছে।

– তাহলে সাংখ্য আর যোগ দর্শন এক?

– একদম ঠিক বলেছ। এজন্যই বেদান্ত-সূত্রকারগণ সাংখ্যের বিরুদ্ধে তাদের যুক্তি উপস্থাপন শেষে বলতেন, 'এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ' অর্থাৎ যা বলা হলো তাতেই যোগ দর্শনও নিরস্ত হলো। তবে একটি পার্থক্য আছে।

– কী পার্থক্য?

– ঈশ্বর বিশ্বাস। সাংখ্য ঈশ্বর মানে না, যোগ মানে।

– কিন্তু তুমি তো সাংখ্য আলাপ করার সময় প্রকৃতির বিকার নিয়ে কিছু বলোনি।

– ঠিক, আমি বলিনি। কারণ আমি তো জানতাম এটা আলাপ করতেই হবে যোগ দর্শন আলাপের সময়। তাই তখন আর আলাপটা করিনি। যোগ দর্শনে চিত্ত সম্পর্কে আরেকটা বিষয় জানতে হয় সেটা হচ্ছে চিত্তভূমি।

– চিত্তভূমিটা কী?

– সাধারণভাবে চিত্তের ভূমি বা অবস্থাকে বলে চিত্তভূমি। কিন্তু যোগমতে চিত্তের সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থাই হলো চিত্তভূমি। চিত্তের স্বাভাবিক অবস্থা পাঁচ ধরনের :

- ক্ষিপ্ত
- মূঢ়
- বিক্ষিপ্ত
- একাগ্র ও
- নিরুদ্ধ।

https://nagorikpathagar.org

– ওরে বাবা! ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত চিত্ত আবার কেমন?

– যে ভূমিতে বা অবস্থাতে চিত্ত স্বভাবতই অত্যন্ত অস্থির, তাকেই ক্ষিপ্ত বলা হয়। ক্ষিপ্ত অবস্থায় চিত্ত রজঃ ও তমঃগুণের প্রভাবে একটা বিষয়ে স্থির থাকে না, বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। এই যে তোমার মতো। মাঝে মাঝেই মনোযোগ হারিয়ে ফেলো। এই সমস্যা অবশ্য আমারও আছে। হা হা হা হা!

– আমার চেয়ে তোমারই বেশি! কিন্তু এই রজঃ আর তমঃ গুণ আবার কী?

– রজের প্রভাবে অহংকারসহ অন্যান্য খারাপগুণের জন্ম হয় এবং তম হলো অন্ধকার।

– তাহলে আমাদের চিত্তভূমি কি ক্ষিপ্ত?

– কিছুটা তো বটেই, তবে চিত্তভূমির সব ধরনের অবস্থাই কমবেশি সবার থাকে। ক্ষিপ্ত চিত্ত কোনো বিষয়ের প্রতিই স্থিরভাবে আকৃষ্ট হয় না বলে অতীন্দ্রিয় বিষয়ে চিন্তা করার মতো স্থৈর্য বা ধীশক্তি থাকে না। বুঝতেই পারছ চিত্তের এই ক্ষিপ্ত অবস্থা যোগ সাধনার উপযোগী নয়।

– মূঢ় চিত্ত কী?

– প্রবল রাগ ও মোহের বশীভূত চিত্তের যে মুগ্ধ অবস্থা, তা-ই মূঢ়চিত্ত বা মূঢ়ভূমি। মূঢ় অবস্থায় তমঃগুণের প্রাধান্য থাকে। তাই অতি মুগ্ধ চিত্ত ভালো-মন্দ বিচার করতে সমর্থ হয় না। মোহাচ্ছন্ন চিত্তে নিষ্ক্রিয়তা, আলস্য, তন্দ্রা বিরাজ করে। চিত্তের এই অবস্থা তত্ত্বচিন্তায় অক্ষম বলে এ অবস্থা যোগ-সাধনার অনুপযোগী।

https://nagorikpathagar.org

– ওরে বাবা। তাহলে উপায় কী? বিক্ষিপ্ত চিত্তও তো তাহলে সাধনার উপযোগী নয়।

– হুঁ, ঠিক। বিক্ষিপ্তচিত্ত ক্ষিপ্ত অবস্থার মতো হলেও তা থেকে কিছুটা উন্নত।

– উন্নত মানে? এই দুইটার তফাত কী?

– বিক্ষিপ্ত চিত্তের সাথে ক্ষিপ্তের তফাত হলো, ক্ষিপ্ত চিত্ত সবসময় অস্থির এবং চঞ্চল থাকে। কিন্তু বিক্ষিপ্ত চিত্ত কোনো কোনো সময়ে স্থির, আবার কোনো কোনো সময়ে চঞ্চল। ক্ষিপ্ত ও মূঢ় চিত্ত তত্ত্বচিন্তায় সম্পূর্ণ অক্ষম। এ কারণে তাদের সমাধি হতেই পারে না। কিন্তু বিক্ষিপ্ত চিত্ত সাময়িকভাবে কোনো বিষয়ে নিবিষ্ট হয়ে তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানে আগ্রহী হলেও তা স্থায়ী হয় না। বিক্ষিপ্ত অবস্থায় চিত্ত তমঃগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়, কিন্তু রজঃ-এর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। তাই বিক্ষিপ্ত অবস্থায়ও যোগ সম্ভব নয়।

– সমাধি কী?

– ওহ হো। আগে একবার বলেছি। চিত্তের সমস্ত বৃত্তি নিরুদ্ধ হলে যে অবস্থায় মানুষ উপনীত হয় তাকে সমাধি বলে।

– এভাবে বলোনি। আচ্ছা। এরপর কী?

– এরপর একাগ্রচিত্ত। যে চিত্তের অগ্র বা অবলম্বন এক তা-ই একাগ্র চিত্ত। একাগ্র অবস্থায় চিত্ত তমের প্রভাবের সঙ্গে রজের প্রভাব থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। এ অবস্থায় সত্তার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে।

– দাঁড়াও, দাঁড়াও। বুঝে নিই। মানে মন অন্য কোনো গুণের প্রভাবে না থেকে শুধু সত্তার প্রভাবে থাকে। তাই তো?

https://nagorikpathagar.org

– হুঁ, একদম ঠিক।

– তুমি কঠিন করে বলেছিলে। তাই সহজ করে নিলাম। হি হি হি!

– আচ্ছা। একাগ্রভূমিতে চিত্ত কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে, অর্থাৎ চিত্ত একটিমাত্র বিষয়ের আকারে স্থির ও অচঞ্চলভাবে অবস্থান করে। এ অবস্থায় চিত্তের অনেক বৃত্তির নিরোধ হলেও সব বৃত্তির নিরোধ হয় না। তা সত্ত্বেও চিত্তের একাগ্র অবস্থা যোগের অনুকূল। এই অবস্থায় চিত্ত সমাধিস্থ হয় এবং এই সমাধিকে বলা হয় সম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

– আচ্ছা। এরপরে?

– এর পরে নিরুদ্ধচিত্ত; চিত্তের পঞ্চম তথা শেষভূমির নাম নিরুদ্ধ। এই অবস্থায় চিত্তের সবধরনের বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। এই স্তরে চিত্ত শান্ত ও সমাহিত। যখন অভ্যাস দিয়ে চিত্তের সকল বৃত্তিই নিরুদ্ধ করে চিত্তকে সম্পূর্ণ স্থির রাখা হয়, তখন চিত্তের নিরুদ্ধভূমিক অবস্থা হয়। এ অবস্থায় চিত্তের কোনো অবলম্বন থাকে না। অবলম্বনহীন এই চিত্তভূমিতে পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করে। এই পুরুষ মানে সাংখ্যের পুরুষ। মনে আছে তো?

– পুরুষ বলতে চেতন আত্মা বা Soul বোঝায়।

– হুঁ, ঠিক। তাহলে 'যোগ' বলতে এইরূপ চিত্তবৃত্তি নিরোধকেই বোঝানো হয়। এ অবস্থায় চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হলেও দেহের কোনো বিকার হয় না। কারণ দেহে তখন আত্মা অবস্থান করে। যোগ সম্প্রদায়ের মতে যোগীর এই অবস্থা প্রমাণ করে যে, আত্মা চিত্ত থেকে ভিন্ন। তাদের মতে আত্মা চিত্ত থেকে ভিন্ন না হলে চিত্তের নিরোধে দেহের বিনাশ হতো। চিত্তবৃত্তির

https://nagorikpathagar.org

নিরোধে আত্মার যে অবস্থান, তা-ই আত্মার স্বরূপে অবস্থান। এ অবস্থাতেই চিত্ত কৈবল্যলাভে অর্থাৎ মুক্তিলাভে সক্ষম হয়। এ অবস্থায় যে সমাধি হয়, তাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা হয়। তার মানে ইউরোপীয় দর্শন আলাপ করেছে মন আর দেহ আলাদা এটা নিয়ে, আর ভারতীয় দর্শন আলাপ করেছে আরও এগিয়ে চিত্ত আর আত্মার ভেদ নিয়ে।

– যোগ ব্যায়াম এল কোথা থেকে তাহলে।

– হ্যাঁ, ভালো প্রশ্ন করেছ। এই সমাধিতে যাওয়া বা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করতে হলে স্তরে স্তরে আটটি যোগের অঙ্গ অতিক্রম করে যেতে হয়। এই আটটি যোগের অঙ্গ নানা যোগাসনের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়।

– আটটি যোগাঙ্গ কী কী?

– যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। তোমাকে আগেই বলেছি যোগশাস্ত্র অনুযায়ী চিত্তবৃত্তি নিরোধের দুটি প্রধান উপায় হলো অভ্যাস ও বৈরাগ্য। বৈরাগ্যের দ্বারা বিষয়ে বৈরাগ্য আসে এবং অভ্যাসের দ্বারা বিবেক-জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। যোগের এই অষ্টাঙ্গ যথা – যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অনুশীলনের মাধ্যমে চিত্তের মলিনতা বিনষ্ট হয় এবং জ্ঞানের দীপ্তি বৃদ্ধি পায়। এই যে অষ্টাঙ্গের একটা অঙ্গ 'ধাসন', সেটাই যোগ ব্যায়াম।

– আচ্ছা বুঝলাম, কিন্তু যম মানে কি যমরাজ, মানে আজরাইল?

– উহুঁ; অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ – এই পাঁচটি সাধনকে একসঙ্গে বলা হয় যম।

– বাবারে, যম বুঝতে গিয়ে না হয় অহিংসা আর সত্য বুঝলাম;

https://nagorikpathagar.org

অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য আর অপরিগ্রহ আবার কী? এত কঠিন শব্দ ব্যবহার করে কেন?

– কঠিন লাগছে কারণ এই শব্দগুলোর চর্চা আমরা করি না তাই। যেসময় লেখা হয়েছিল এসব নিশ্চয় সেই সময় বোঝানোর মতো করেই লেখা হয়েছিল। আর তোমার প্রশ্নের জবাব তো দিচ্ছিই, তাই না?

অস্তেয় হলো চৌর্যবৃত্তি পরিত্যাগ। যা নিজের নয় এমন দ্রব্য, এককথায় যা পরদ্রব্য তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা, এমনকি তাতে স্পৃহাও না করা হলো অস্তেয়। আর ব্রহ্মচর্য হলো এইজন্য সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করে অল্প আহার এবং অল্প নিদ্রার বিধান। আর অপরিগ্রহ হলো দেহরক্ষার বা প্রাণধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া সমস্ত প্রকার ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা বর্জন, এবং অপরের দান অগ্রহণ।

– বাহ, সবগুলোই তো ভালো ভালো কথা।

– হা হা হা হা! তাই তো!

– আচ্ছা যোগের যেই অষ্টাঙ্গ বললে সেটার আসন, নিয়ম বুঝলাম, কিন্তু প্রায়াণাম, প্রত্যাহার আর ধারণা কী?

– যোগমতে প্রত্যাহার হলো আমরা যেটাকে বলি ইউথড্রয়াল, জাগতিক সমস্ত বিষয় থেকে নিজেকে প্রত্যাহার। আরও স্পষ্ট করে বললে, ইন্দ্রিয়গুলোকে নিজ নিজ বিষয় থেকে সরিয়ে এনে চিত্তের অনুগত করাই প্রত্যাহার। ধারণা হলো, শরীরের কোনো অংশে অথবা কোনো বস্তুতে চিত্তকে আবদ্ধ করে ধ্যান করা। যেমন পূজার সময় দেখা যায় অন্য বিষয় থেকে সরিয়ে এনে চিত্তকে শরীরের মধ্যে নাভিচক্র বা নাকের ডগায় স্থাপন

https://nagorikpathagar.org

করা হয়, অথবা দেবমূর্তিতে চিত্তকে স্থির রাখা হয়।

– তাহলে হিন্দু ধর্মের দেবমূর্তি এসেছে 'ধারণা' নামের দার্শনিক প্রয়োজনে।

– ঠিক ধরেছ। চিত্ত নিবিষ্ট করার প্রয়োজনে।

– আর প্রাণায়াম?

– প্রাণায়ামের তিনটি অঙ্গ। আসো, প্র্যাক্টিস করে দেখাই। নাকের একটা ফুটো বন্ধ করে আরেকটা ফুটো দিয়ে যতটা সম্ভব বাতাস টেনে নাও।

– উম ম ম ম! এরপর?

– আরে না, ছেড়ে দিলে চলবে না। ধরে রাখতে হবে। টেনে নেয়ার নাম পূরক, ধরে রাখার নাম কুম্ভক, আর যে নাক বন্ধ রেখেছিলে সেটা দিয়ে আস্তে আস্তে ছেড়ে দেয়ার নাম রেচক।

– এটা করে লাভ কী?

– স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস একটা ছন্দ অনুসারে বিরামহীনভাবে চলে। ঐ শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে গতিবিচ্ছেদ আনাই প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য। শ্বাস নিয়ে প্রশ্বাস না ফেলে থাকা অবস্থায় যে গতিবিচ্ছেদ হয়, সেটি একপ্রকার প্রাণায়াম। আবার প্রশ্বাস ফেলে শ্বাস না নিয়ে থাকলে যে গতিবিচ্ছেদ হয়, সেটাও একপ্রকার প্রাণায়াম।

– আচ্ছা বুঝলাম, কিন্তু এতে লাভ কী?

– প্রাণায়াম অভ্যাস করতে করতে সিদ্ধ হওয়া যায়, তখন বুদ্ধিসত্ত্বের প্রকাশ হয়। বুদ্ধিসত্ত্বের প্রকাশ হলে তার অদ্ভুত ক্ষমতা তৈরি হয়। সেই ক্ষমতাবলে ধারণাশক্তি তৈরি হয়।

https://nagorikpathagar.org

তাহলে প্রাণায়াম হচ্ছে ধারণা শক্তি তৈরির উপায়। 'ধারণা' বিষয়টা কি মনে আছে?

– হুঁ, খুব।

– এবার তাহলে অন্য দর্শনে যাওয়ার পালা।

– যোগ দর্শন শেষ!

– হুঁ, আপাতত। চাইলে তুমি আরো গভীরে প্রবেশ করতে পারো। কিন্তু দর্শন হিসেবে জানার জন্য যেটুকু দরকার তা আলাপ করেছি।

– এর পরে কী?

– বৈশেষিক দর্শন। তবে আজ নয় আর। আরেকদিন নতুন করে। তুমি আবার আগেরগুলো ভুলে যেও না কিন্তু।

https://nagorikpathagar.org

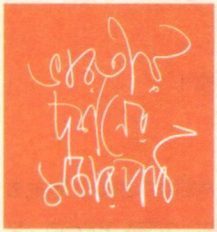

আমাদের দর্শন আলোচনা বন্ধ। পুত্র ব্যস্ত, আমিও ব্যস্ত। আবার ফুরসত মিলল কয়েকদিন পরে। পুত্রেরই জিজ্ঞাসা দিয়ে শুরু।

– আচ্ছা, বাবা, এই যে এত দার্শনিক চিন্তা, আবার নানা সূক্ষ্ম আলোচনা, এই দার্শনিকদের মধ্যে ঝগড়া হতো না?

– খুব হতো। প্রত্যেক দর্শন আলোচনার ভিতরে ঢুকলে দেখবে এক দর্শন আরেক দর্শনকে খণ্ডন করছে। মূলত এটা হতো তর্কে, তবে তা কখনো কখনো সহিংসও হতো। অনেক সময় এই তর্কযুদ্ধে দার্শনিকেরা যেতেন তাদের শিষ্যদের সাথে নিয়ে। সেই শিষ্যরা অনেক সময় তর্ক থেকে হাতাহাতিতে নেমে যেত, সেটা অনুমান করা যায়। সেটার প্রমাণ নানা জায়গায় আছে। যেমন ধরো উপনিষদে আছে যাজ্ঞবল্ক্য আর শালক্যের তর্ক। সেখানে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় শালক্যের মাথা খসে পড়েছিল। এখন ধরো, মাথা তো উত্তর না দিতে পারলে খসে যাবে না। আসলে যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে এই তর্কের এক পর্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্যরা শালক্যের মাথা

https://nagorikpathagar.org

খসিয়ে দিয়েছিল বা গর্দান নামিয়ে দিয়েছিল।

– সর্বনাশ। দার্শনিক বিতর্কেও রক্তপাত?

– দর্শন যখন শুধু দর্শন থাকে না ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত হয়ে যায় তখন রক্তপাত অবশ্যম্ভাবী। তোমাকে আগেই বলেছি দর্শন মানে শুধু দর্শন নয়; এই দর্শনের ভিতরে আছে সবকিছু।

– হুঁ, তা মনে আছে। তো এবার কি আমরা বৈশেষিক দর্শন নিয়ে আলোচনা করব?

– হ্যাঁ। বৈশেষিক দর্শন ভারতীয় দর্শনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সহজ।

– তাই?

– হ্যাঁ, এটাতে সূক্ষ্ম বিচার কম। এখানে বস্তুর যা যা বিচার করা হয়েছে তা খুব দীর্ঘ বা জটিল নয়। আর তোমাকে আগেই বলেছি বৈশেষিক দর্শন আসলে ভারতের প্রাচীন পদার্থবিজ্ঞান। মনে আছে?

– হুঁ, মনে আছে।

– বৈশেষিক দর্শনে দুই ধরনের প্রমাণকে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ আর অনুমান। আর দর্শনের সূত্রকারেরা আলোচনা করেছেন পদার্থ নিয়ে।

– পদার্থ মানে ম্যাটার বা বস্তু কি?

– উহুঁ, ভারতীয় দর্শনে যেসব জিনিসের তত্ত্বজ্ঞান থেকে মুক্তি হয় তা-ই পদার্থ। বৈশেষিক দর্শন অনুসারে পদার্থ ছয়টি। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। এখানে দুইটা বিষয়ে তোমাকে আগেই বলে নিই – সামান্য ও বিশেষ।

https://nagorikpathagar.org

এখানে সামান্য মানে কিন্তু স্মল নয়। সামান্য মানে সর্বজনীন বা ইউনিভার্সাল। শব্দটির সাধারণ অর্থ হলো একাধিক বস্তুর সমান ধর্ম। বহু বস্তুর মধ্যে যে ধর্ম থাকে তা-ই সমান ধর্ম। যেমন মনুষ্যত্ব হলো সকল মানুষের সমান ধর্ম, অথবা গোত্ব হলো সকল গরুর সমান ধর্ম। এই সামান্যের ব্যবহার দেখবে লালনের গানে।

পাবে সামান্যে কি তার দেখা
(ওরে) বেদে নাই যার রূপরেখা॥
কেউ বলে, পরম মিষ্টি কারো না হইল দৃষ্টি।
বরাতে দুনিয়া সৃষ্টি। তাই নিয়ে লেখাজোখা।
(ওরে) তাই নিয়ে লেখাজোখা॥
নিরাকার ব্রহ্ম হয় সে সদাই ফেরে অচিন দেশে।
দোসর তাই নাইকো পাশে। ফেরে সে একা একা।
(ওরে) ফেরে সে একা একা॥

আর বিশেষ মানে তো জানোই স্পেসিফিক।

– আচ্ছা। তাহলে এখানে ধর্ম বলতে কী বোঝাচ্ছে?

– এই ধর্ম মানে কিন্তু রিলিজিওন নয়। তবে কাছাকাছি। ধর্ম মানে হচ্ছে শাস্ত্র মেনে আচার করলে জীবাত্মায় যে বিশেষ গুণ উৎপন্ন হয় তাই ধর্ম।

– আচ্ছা, আর বাকি পদার্থগুলো?

– আসছি একে একে। প্রথমে দ্রব্য। দ্রব্যের তিনটি লক্ষণ। এক. যা ক্রিয়ার আশ্রয় বা ক্রিয়াবৎ তা-ই দ্রব্য; দুই. যা গুণের আশ্রয় বা গুণবৎ তা-ই দ্রব্য; এবং তিন. যা গুণ ও কর্মের সমবায়ী কারণ তা-ই দ্রব্য। সমবায়ী কারণ বিষয়টা আলাদা

https://nagorikpathagar.org

করে নোক্তা দিয়ে রাখতে পারো। আমরা যখন সমবায় আলাপ করব তখন না হয় আবার এখানে ফিরে আসা যাবে। তাহলে সহজ করে বলতে গেলে গুণ বা ক্রিয়া বা উভয়েই যাকে আশ্রয় করে থাকে তা হলো দ্রব্য। একটা উদাহরণ দিই, ঘোড়া হলো দ্রব্য কারণ ঘোড়া হলো গতিবান। গতি একটি ক্রিয়া এবং ঘোড়া হলো তারই আশ্রয়। এই কারণে ঘোড়া একটি দ্রব্য। একইভাবে প্রবহমান জলও দ্রব্য, কারণ সেখানেও প্রবাহ বা গমন নামের ক্রিয়া আছে।

আবার দেখ নীল পাত্র একটি দ্রব্য, কারণ সেখানে নীল গুণ আছে। অথবা শ্বেতপদ্মে শ্বেতত্ব গুণ আছে, এ কারণে শ্বেতপদ্মটি একটি দ্রব্য।

এখানে একটা মজার জিনিস লক্ষ করতে পারো; কেবলমাত্র কোনো আশ্রয়েই গুণগুলি উৎপন্ন হয়। এর অর্থ গুণের আশ্রয় বা দ্রব্য প্রথমে উৎপন্ন হলে তবে সেখানে গুণ উৎপন্ন হবে। সেক্ষেত্রে গুণ উৎপন্ন হওয়ার আগে দ্রব্যটি হবে গুণশূন্য। সুতরাং দ্রব্যের এমন একটি অবস্থা আছে যা গুণের আশ্রয় নয়।

বৈশেষিক মতে দ্রব্য নয় প্রকার। যথা – ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ্ (জল), তেজ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু), ব্যোম (আকাশ), দিক, কাল, আত্মা এবং মন। মজার বিষয় হচ্ছে মনকে আত্মা থেকে পৃথক বলা হয়েছে এবং মনকে একটা পদার্থ বলা হয়েছে। এই নয়টি দ্রব্যের মধ্যে ব্যোম (আকাশ), দিক, কাল, আত্মা এবং মন হচ্ছে নিত্য দ্রব্য; মানে যার বিনাশ নেই, উৎপত্তি নেই ও পরিবর্তন নেই। এই নয়টি দ্রব্যের মধ্যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্‌কেই পঞ্চভূত বলা হয়।

– ভূত আবার কেন এখানে? ভূত মানে কী?

https://nagorikpathagar.org

– পঞ্চভূত দিয়েই আমাদের এই দৃশ্যমান জগৎ তৈরি হয়েছে তাই একে ভৌতজগৎও বলা হয়। আর যে দ্রব্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষ গুণ আছে তাকে ভূতদ্রব্য বলে। এই ভূতদ্রব্যগুলির মৌলিক আদি উপাদান হলো যথাক্রমে ক্ষিতি পরমাণু, অপ্ পরমাণু, তেজ পরমাণু এবং মরুৎ পরমাণু। এই পরমাণুগুলি নিত্য অর্থাৎ, এদের উৎপত্তি ও বিনাশ নেই এবং এরা নিরাবয়ব। কিন্তু এই সমস্ত পরমাণুর সংযোগের ফলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে স্থূল ক্ষিতি, স্থূল অপ্, স্থূল তেজ ও স্থূল মরুৎ উৎপন্ন হয়, এগুলি অনিত্য। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ যৌগিক দ্রব্য বলে এদের উৎপত্তি ও বিনাশ রয়েছে। বৈশেষিক মতে পরমাণুগুলি অতীন্দ্রিয়, এ কারণে পরমাণু প্রত্যক্ষ হয় না। পরমাণুর অস্তিত্ব অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ করা হয়েছে।

– আচ্ছা। 'তেজ' মানে কী?

– তেজ হলো সেই দ্রব্য যাতে উষ্ণ স্পর্শ থাকে। আরেকটা জিনিস ভালো করে বুঝে নিতে পারো সেটা হচ্ছে ভারতীয় দর্শন কাল বা টাইমকে কীভাবে দেখেছে। এই টাইমের ধারণা তুমি ইউরোপীয় দর্শনেও পাবে। তাই এটা একটু বিস্তারিত আলাপ করা থাকলে সুবিধা।

বৈশেষিক দর্শনে সপ্তম দ্রব্য হলো কাল বা সময়। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এরূপ ব্যবহারের হেতু যে দ্রব্য, তাই কাল। কালের রূপ নেই, এজন্য কাল অপ্রত্যক্ষ। কালের কল্পিত বিভাগ হলো মুহূর্ত। কাল জড়পদার্থ নয়, তাই কাল অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য। বৈশেষিক মতে কাল এক, বিভু ও নিত্য। কালের কোনো বিশেষ গুণ নেই, সামান্য গুণ আছে। সামান্য গুণগুলি হলো সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ। কালে আশ্রিত পদার্থসমূহের ক্রিয়ার জন্য কাল অতীত, বর্তমান,

https://nagorikpathagar.org

ভবিষ্যৎ, ক্ষণ, প্রহর, দিন, মাস ভেদে ভিন্ন ভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাল এক ও অখণ্ড। উৎপত্তি ও বিনাশ না থাকায় কাল নিত্য। মহাপ্রলয়ে অনিত্য পদার্থসমূহের ধ্বংস কালেই প্রত্যক্ষিত করতে হয়। তাই প্রলয়েও কাল জগৎ-বিনাশের সাক্ষী হিসেবে অক্ষতই থাকে। আবার জগতের সৃষ্টি কালেই উৎপাদন করতে হয় বলে কাল অনাদি। অনাদি ও অবিনাশী কাল সেকারণেই নিত্য। কাল সবকিছুর আধার এবং সকল কার্যের নিমিত্ত কারণ। এই কালের ধারণা থেকেই মা কালীর ধারণা এসেছে। মা কালী মানে মহাকাল। এবার কি তুমি ধ্বংস, নিত্য, জগন্মাতা এসব বিষয় কালীর ধারণার সাথে মিলিয়ে বুঝতে পারছ?

– হুঁ, পারছি।

– কালী সব কিছুর আধার, তিনি ধ্বংস প্রত্যক্ষ করেন, তিনি নিত্য। আবার ধ্বংস সৃষ্টির শর্ত। তাই যেহেতু তিনি সবসময় জন্মও দিচ্ছেন তাই তার গায়ে কোনো কাপড় নেই।

এরপরে আত্মা বা Soul। বৈশেষিক দার্শনিকেরা আত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মন থেকে স্বতন্ত্র একটি নিত্যদ্রব্য বলেছেন। আত্মা জ্ঞানের অধিকরণ বা আশ্রয়। আত্মা দুই রকম – জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা ঈশ্বর। জীবাত্মার জ্ঞান অনিত্য, কিন্তু পরমাত্মা বা ঈশ্বর নিত্য জ্ঞানবান।

এরপর গুণ। এটা কিন্তু পদার্থের গুণ বা ক্যারেক্টার। যে পদার্থ দ্রব্যে অবস্থান করে এবং যার কোনো কর্ম নেই তার নাম গুণ। গুণ সব সময়ই দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে। দ্রব্য ছাড়া গুণের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই।

গুণপদার্থ চব্বিশ রকমের।

https://nagorikpathagar.org

– ওরে বাবা, চব্বিশ রকমের!

– হুঁ, কিন্তু খুব মজার। এই চব্বিশ রকম গুণের মধ্যে সতেরোটি গুণ মহর্ষি কণাদ তাঁর বৈশেষিকসূত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। এই সতেরোটি গুণ হলো – রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি বা জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন। অর্থাৎ এর বাইরে রয়েছে আরো সাতটি।

– অনেকগুলোই তো বুঝলাম না।

– সেগুলোর কয়েকটা আলাদা করে বলছি। বাকিগুলো তুমি আস্তে আস্তে জেনে নেবে। ইংরেজি বললে বুঝতে পারবে সহজে। তাহলে দেখবে কত আগেই পদার্থ বিজ্ঞান যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সেখানে ভারতীয় দার্শনিকেরা পৌঁছে গিয়েছিলেন। পরত্ব (Remoteness) ও অপরত্ব (Proximity)

– মানে দূরবর্তী হচ্ছে পরত্ব এবং অপরত্ব হচ্ছে নিকটবর্তী।

– বাহ, এটা তো বেশ সহজ মনে হচ্ছে।

– সতেরোটির বাইরে রয়েছে গুরুত্ব, দ্রব্যত্ব, স্নেহ, সংস্কার ইত্যাদি। গুরুত্ব মানে Heaviness। বুঝতেই পারছো গুরুত্ব হলো দ্রব্যের এমন গুণ যার জন্য দ্রব্য নিচের দিকে পতিত হয়। আবার দ্রবত্ব মানে Fluidity। দ্রব্যত্ব হলো দ্রব্যের সেই গুণ যার জন্য দ্রব্য গড়িয়ে পড়ে। স্নেহ মানে Viscosity। স্নেহ হলো সেই গুণ যে গুণের প্রভাবে চূর্ণবস্তু সংলগ্ন হয়। সংস্কার তিন প্রকার – বেগ, ভাবনা ও স্থিতিস্থাপক। বেগ সংস্কার মানে হচ্ছে speed, ভাবনা সংস্কার মানে psychical trace। আর স্থিতিস্থাপক সংস্কার মানে হচ্ছে elasticity।

https://nagorikpathagar.org

– আচ্ছা তাহলে প্রযত্ন? এটার মানে কি কেয়ার অব?

– আরে না! কৃতি বা প্রচেষ্টাকে প্রযত্ন বলে। প্রযত্ন আবার তিন ধরনের – প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি। ইচ্ছা থেকে ঐ ইচ্ছার বিষয়কে প্রাপ্তির যে প্রযত্ন বা চেষ্টা, তাকে বলে প্রবৃত্তি প্রযত্ন। দ্বেষ থেকে ঐ দ্বেষের বিষয়কে পরিহারের যে প্রযত্ন বা চেষ্টা, তাকে বলে নিবৃত্তি প্রযত্ন। আর যে প্রযত্ন প্রাণীর শরীরের শ্বাস-প্রশ্বাসের কারণ হয় তাকে বলে জীবনযোনি প্রযত্ন।

– আচ্ছা, এবার বাকি থাকল সমবায়। এটার মানে নিশ্চয় কো-অপারেটিভ নয়? হি হি হি।

– তা তো নয়ই। এটা হলো বৈশেষিক দর্শন অনুসারে যে ছয়টি পদার্থ তার একটি। মূলত দুটি পদার্থের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য ও নিত্য সম্পর্কের নাম 'সমবায়'। সমবায়ের গুরুত্বপূর্ণ দুটি লক্ষণ চিহ্নিত করা হয়েছে, 'অযুতসিদ্ধানাম্' বা অযুতসিদ্ধরূপী এবং 'আধার্যাধারভূতানাং' বা আধার-আধেয়রূপ পদার্থ। অযুতসিদ্ধ পদার্থ হলো সেই পদার্থ, যা অন্য একটি পদার্থের সঙ্গে এমনভাবে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে থাকে যে ঐ দুই পদার্থের কোনো একটির বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত একটিকে অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যেমন সুতার সঙ্গে কাপড়ের সম্বন্ধ। কাপড় সুতার মধ্যেই অবস্থান করে। কাপড় ও সুতা পৃথকভাবে অবস্থান করতে পারে না।

সমবায়ের অপর লক্ষণটি হলো আধার্যাধার বা আধার-আধেয়ভাব। সমবায়ের আধার-আধেয়ভাব একপাক্ষিক। যেমন মনুষ্যত্ব বা জাতি রাম-শ্যাম প্রভৃতি ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে এমনভাবে সম্বন্ধযুক্ত থাকে যে, ব্যক্তিমানুষের নাশ না হওয়া পর্যন্ত তা ব্যক্তিমানুষ থেকে পৃথক করা যায় না। তেমনি ঘট

https://nagorikpathagar.org

থেকে ঘটের রূপকে, কাপড় থেকে তন্তু বা সুতাকে, ঘট বা কাপড়কে অক্ষুণ্ন রেখে পৃথক করা যায় না। ব্যক্তিমানুষ ও মনুষ্যত্ব জাতি, ঘট ও ঘটরূপ, কাপড় ও তন্তুকে তাই অযুতসিদ্ধ পদার্থ বলা হয়। এগুলির সম্পর্ক আবার আধার-আধেয় সম্পর্ক। আধেয় মনুষ্যত্ব জাতির আধার হচ্ছে ব্যক্তিমানুষ, আধার ঘটরূপে আধেয় হচ্ছে ঘট ইত্যাদি। এদের পারস্পরিক সম্বন্ধ হলো সমবায় সম্বন্ধ।

– তাহলে কি সব পদার্থ সম্বন্ধেই আলাপ হলো?

– মোটামুটি, তবে একটা বাদ পড়ে গেছে। সেটা হচ্ছে কর্ম। কর্ম পাঁচ রকম – উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন। মানে হচ্ছে উপরে ওঠা, নিচে নামা, সংকুচিত হওয়া, প্রসারিত হওয়া আর সোজা একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন।

– আচ্ছা বৈশেষিক পরমাণুবাদ বলেছিলে সেটা কী, আর গ্রিক দর্শনের পরমাণুবাদের সাথে এর মিল বা অমিল কোথায়?

– বাহ, বেশ মনে রেখেছ তো! বৈশেষিক দর্শন মতে জগৎ সৃষ্টি উদ্দেশ্যপূর্ণ। এই উদ্দেশ্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। এটি যান্ত্রিক নয়। জীব যাতে তার অদৃষ্ট বা কর্মফল অনুসারে পুণ্যের জন্য পুরস্কার এবং পাপের জন্য শাস্তি ভোগ করতে পারে এবং জীবাত্মা যাতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করতে পারে সে জন্যই পরমাত্মা বা ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন। বৈশেষিক সম্প্রদায় পরমাণুবাদের সাহায্যে জগতের সৃষ্টি ও লয় ব্যাখ্যা করেছেন। তাই পরমাণুবাদ বা পরমাণুতত্ত্ব বৈশেষিক দর্শনের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব।

ভারতীয় দর্শনে দৃশ্যমান জগতে বস্তুর কার্য-কারণ ভাবের দ্বারাই তাদের স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে। জগতের

https://nagorikpathagar.org

উপাদান কারণ হচ্ছে পরমাণুসমূহ, যা সৎ অর্থাৎ নিত্য। জগতের যাবতীয় অনিত্য ও যৌগিক বস্তু পরমাণু থেকেই উৎপন্ন। তাহলে তুমি উল্টোভাবে বলতে পারো – পরমাণু হলো জগতের উৎপত্তির প্রতি উপাদান কারণ। চারটি অনিত্য ভূতদ্রব্যের ক্ষুদ্রতম এবং অবিভাজ্য অংশই হলো পরমাণু। অর্থাৎ পরমাণু চারপ্রকার – ক্ষিতি পরমাণু, জল পরমাণু, তেজ পরমাণু এবং বায়ু পরমাণু। এই পরমাণুগুলির গুণগত পার্থক্য থাকায় এরা প্রত্যেকে ভিন্ন। ক্ষিতি পরমাণুর গুণ হলো গন্ধ, জল পরমাণুর গুণ হলো স্বাদ, তেজ পরমাণুর গুণ হলো রূপ এবং বায়ু পরমাণুর গুণ হলো স্পর্শ।

যেহেতু পরমাণু হলো জড়বস্তুর অবিভাজ্য ও ক্ষুদ্রতম অংশ, তাই পরমাণু অতীন্দ্রিয়। এ কারণে প্রত্যক্ষের দ্বারা পরমাণুকে জানা যায় না। অনুমান প্রমাণের দ্বারাই পরমাণুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। এই অনুমান প্রমাণ হিসেবে ন্যায়-বৈশেষিক মতে বলা হয়, জড়বস্তুকে যদি ভাঙতে শুরু করি তাহলে ভাঙতে ভাঙতে আমরা এমন একটা অংশে উপনীত হই যাকে আর বিভাগ করা যায় না। জড়বস্তুর এই অবিভাজ্য ও ক্ষুদ্রতম অংশকেই পরমাণু বলা হয়। পরমাণু অবিভাজ্য অর্থাৎ পরমাণুকে আর ভাঙা যায় না, কারণ পরমাণু হলো নিরংশ বা নিরবয়ব। কেননা যার অংশ বা অবয়ব নেই তাকে ভাঙা যায় না।

যেহেতু পরমাণু নিরবয়ব, সেহেতু পরমাণু নিত্য। অর্থাৎ পরমাণুর উৎপত্তি ও বিনাশ নেই। উৎপত্তি অর্থ বিভিন্ন অবয়বের সংযোগ, এবং বিভাগ অর্থ বিভিন্ন অবয়বের বিভাগ। যেহেতু পরমাণুর কোনো অবয়বই নেই, সেহেতু পরমাণুর উৎপত্তি ও বিনাশ নেই।

ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকেরা এই পরমাণুর সাহায্যে জগতের

https://nagorikpathagar.org

যাবতীয় অবয়ব এবং অনিত্য বিষয়ের সৃষ্টি ও ধ্বংসকে ব্যাখ্যা করেছেন। আগেই বলা হয়েছে যে, পরমাণুগুলি বিশেষ গুণবিশিষ্ট। অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ গুণবিশিষ্ট। কিন্তু গুণবিশিষ্ট হলেও তারা গতিহীন অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়। তাহলে গতি ছাড়া সৃষ্টি-প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা যাবে কীভাবে?

মূলত এখানেই ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকেরা জগতের নিমিত্ত-কারণ হিসেবে একজন ঈশ্বর বা পরমাত্মার সত্তা স্বীকার করেন। তাঁদের মতে, পরমাণুগুলি স্বরূপত গতিহীন হলেও ঈশ্বরের ইচ্ছায় (চিকীর্ষা) গতিশীল হয়ে জগতের যাবতীয় বস্তুকে সৃষ্টি করে।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন আসে, ঈশ্বর যেহেতু পূর্ণতম সত্তা, তাঁর কোনো অপূর্ণ ইচ্ছা নেই, তাহলে পরমাণুগুলিকে গতিশীল করে জগৎসৃষ্টির ইচ্ছা ঈশ্বরের মনে জাগে কেন?

উত্তরে ন্যায়-বৈশেষিকেরা বলেন, জীব যাতে অদৃষ্ট অনুযায়ী কর্মফল ভোগ করতে পারে, সেজন্য ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টির ইচ্ছা হয়। অদৃষ্ট হলো জীবের শুভ ও অশুভ কর্মফলের সমষ্টি। পরমাণু ও অদৃষ্টের নিজস্ব ক্রিয়াশীলতা নেই। তাই ঈশ্বর জীবের অদৃষ্টশক্তি অনুসারে তাদের কর্মফল ভোগের জন্য পরমাণুগুলির সাহায্যে এই সুশৃঙ্খল ও সুপরিকল্পিত জগৎ সৃষ্টি করেছেন। আবার প্রয়োজনবোধে তিনি পরমাণুগুলির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে জগতের বিনাশসাধন করেন।

– আচ্ছা। তাহলে বৈশেষিক পরমাণুবাদ ও পাশ্চাত্য দর্শনের পরমাণুবাদের মধ্যকার পার্থক্য কী?

– পাশ্চাত্য দর্শনের পরমাণুবাদ ও বৈশেষিক পরমাণুবাদের মধ্যে বেশ কিছু সাদৃশ্য থাকলেও কিছুটা বৈসাদৃশ্যও আছে।

https://nagorikpathagar.org

যেমন :

১. বৈশেষিক পরমাণুবাদে জগৎ সৃষ্টি উদ্দেশ্যমূলক। কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনের পরমাণুবাদে সৃষ্টির মূলে কোনো উদ্দেশ্য বা আদর্শ নেই। জগতের প্রতি ভারতীয় দার্শনিকদের একপ্রকার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যা বৈশেষিক দর্শনেও প্রতিফলিত হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনের পরমাণুবাদ অনুসারে অসংখ্য পরমাণু আকস্মিক যান্ত্রিক গতির দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেছে।

২. বৈশেষিকদের মতে পরমাণু নিত্য। আকাশ, দিক, কাল, মন ও আত্মা নিত্য। এদের কোনো উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। আকাশ, দিক, কাল, মন ও আত্মাকে পরমাণুতে পরিণত করা যায় না। কিন্তু পাশ্চাত্য পরমাণুবাদ অনুসারে মন ও আত্মা পরমাণু দ্বারা সৃষ্ট।

৩. পাশ্চাত্য পরমাণুবাদ অনুসারে জগৎ সৃষ্টির পেছনে এমন কোনো কর্তা নেই যার দ্বারা পরমাণুগুলি অনুশাসিত হতে পারে। কিন্তু বৈশেষিক পরমাণুবাদ বিশ্বাস করে যে, জগৎ সৃষ্টির পেছনে একজন সর্বশক্তিমান কর্তা রয়েছেন, যার ইচ্ছায় জগতের সৃষ্টি ও বিনাশ সংঘটিত হয়।

– আচ্ছা। বুঝতে পারলাম। এরপরে কী আসবে?

– এরপর আসবে ন্যায় দর্শন। সাংখ্য আর যোগের সম্পর্ক যেমন, তেমন সম্পর্ক বৈশেষিক আর ন্যায়ের মধ্যে। এই দুই দর্শন খুব কাছাকাছি। বলতে পারো বৈশেষিক দর্শন মূলত পদার্থবিদ্যা হওয়ার কারণে ন্যায় দর্শনের সাথে তার বন্ধুত্ব করতে হয়েছে। তবে এটা আজকে আর নয়, আরেকদিন সে আলাপ হবে নিশ্চয়।

https://nagorikpathagar.org

ব্যস্ততার জন্য আমাদের আলাপ অনেক দিন ধরে বন্ধ। আজ আবার পুত্রই আলাপটা শুরু করে।

– অনেকদিন তো হয়ে গেল মাঝামাঝি এসে ছেড়ে দিলে কেন?

– তোমার মনে আছে কী কী বলেছিলাম?

– হুঁ, খুব মনে আছে। আমরা বৈশেষিক দর্শন শেষ করেছিলাম। এর পরে তো ন্যায় দর্শন। তাই না? তুমি বলেছিলে বৈশেষিক আর ন্যায়ের মধ্যে খুব একটা তফাত নেই।

– হুঁ, ঠিক মনে আছে। ন্যায়দর্শনের সূত্রকার হচ্ছেন গৌতম অক্ষপাদ। ন্যায় দর্শনে তিনটে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। এক নম্বর হচ্ছে, ন্যায় দর্শনের দুটি শাখা। প্রাচীন ন্যায় ও নব্য ন্যায়। এর মধ্যে নব্য ন্যায় পুরোটাই বাঙলার দর্শন, নদীয়ার। দুই নম্বর হচ্ছে, এই ন্যায় দর্শন থেকেই এসেছে তর্কশাস্ত্র। আর তিন নম্বর হচ্ছে, ন্যায় দর্শনে আলাদা করে পরাতত্ত্ব আলোচনা করা হয়েছে।

– পরাতত্ত্ব কী?

https://nagorikpathagar.org

– অহ হো, বলা হয়নি বোধ হয়! পরাতত্ত্ব হচ্ছে ইউরোপীয় দর্শনের মেটাফিজিক্স।

– ধুর, একটা কঠিন বিষয় বুঝাতে আরেকটা কঠিন বিষয় আনলে! মেটাফিজিক্স কী?

– আচ্ছা বলছি। চেতনা ও জ্ঞানের অন্বেষণই হলো ফিলোসফি বা দর্শনশাস্ত্র। এই অন্বেষণের চরিত্র অনুযায়ী ফিলোসফিকে মোটা দাগে দুই ধরনের ভাগে ভাগ করা হয়। মেটাফিজিক্স বা পরাতত্ত্ব বা অধিবিদ্যা এবং এপিসটেমোলজি বা জ্ঞানতত্ত্ব। আরো একটি ভাগ রয়েছে এক্সিওলজি বা মূল্যতত্ত্ব। মেটাফিজিক্স অধ্যাত্ম অনুসন্ধান করে, অন্যদিকে এপিসটেমোলজি জ্ঞান অনুসন্ধান করে ।

– প্রাচীন ন্যায় আর নব্য ন্যায়ে তফাত কী?

– প্রাচীন ন্যায়ে আলোচিত হয়েছে দর্শন আর নব্য ন্যায়ে আলোচিত হয়েছে কেবল তর্কশাস্ত্র। তাই দর্শন আলোচনা করতে হলে প্রাচীন ন্যায়ই আলোচনা করতে হবে।

– আচ্ছা, এটাকে ন্যায় কেন বলা হয়?

– এই শাস্ত্র আলোচনায় মানুষের বুদ্ধি স্থির মীমাংসায় উপনীত হয় বলে এই শাস্ত্রকে বলা হয় ন্যায়। যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে হলে কী কী উপায় অবলম্বন করে শুদ্ধ চিন্তায় উপনীত হতে পারা যায় তা-ই হলো ন্যায় দর্শনের মূল উদ্দেশ্য। তাই যথার্থ জ্ঞান লাভের প্রণালি হিসেবেই ন্যায় দর্শনকে আখ্যায়িত করা হয়।

ন্যায় দর্শন যুক্তিমূলক বস্তুবাদী দর্শন। ন্যায় দর্শন মনে করে বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞান-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। কারণ বস্তুর অস্তিত্ব

https://nagorikpathagar.org

আমাদের জানা বা না-জানার উপর নির্ভর করে না।

ন্যায় দর্শনে যুক্তি-তর্ক এবং জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনার প্রাধান্য থাকলেও যুক্তি-তর্ক করাই কিন্তু ন্যায় শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য নয়। ভারতীয় অন্যান্য দর্শনের মতোই ন্যায় দর্শনের চরম উদ্দেশ্য হলো মুক্তি বা মোক্ষ। যুক্তিসিদ্ধ চিন্তা এই পরম মোক্ষলাভের সহায়ক। ন্যায় দর্শন বৌদ্ধ দর্শনের মতো মানুষের পার্থিব জীবনকে দুঃখময় হিসেবে গণ্য করে এবং মোক্ষপ্রাপ্তিকেই মানব জীবনের পরম লক্ষ্য বলে।

– দুঃখ কেন?

– অবিদ্যা হলো দুঃখের কারণ; এবং তত্ত্বজ্ঞান বা যথার্থজ্ঞান দিয়েই অবিদ্যা দূর করে মোক্ষ লাভ করা সম্ভব। ন্যায় মতে জীবের মোক্ষলাভের জন্য ষোলোটি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান প্রয়োজন। তাই ন্যায় দর্শনে পদার্থ ছয়টি নয়, ষোলোটি। এই ষোলোটি পদার্থের বিস্তৃত আলোচনাই ন্যায় দর্শন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা সম্ভব কি না তা নির্ধারণ করার জন্য জ্ঞান অর্জনের প্রণালি কী হতে পারে তা ঠিক করবে জ্ঞানতত্ত্ব বা এপিসটেমোলজি। এটা নিয়ে পরে আবার বলব। ন্যায় দর্শনের প্রধান তত্ত্বগুলি হলো – জ্ঞানতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব এবং ঈশ্বরতত্ত্ব।

– ষোলোটি পদার্থ কী কী?

– এই ষোলোটি পদার্থ হলো : প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান।

– ন্যায় মতে যে কোনো পদের অর্থই হলো পদার্থ। পদ হচ্ছে

https://nagorikpathagar.org

'শব্দ', ন্যায় দর্শনে শব্দই 'পদ'। অর্থাৎ, কোনো পদ দিয়ে যে অর্থ বা বিষয় নির্দেশিত হয়, তাই পদার্থ। প্রতিটি পদার্থই জ্ঞেয়, প্রমেয় এবং অভিধেয়।

– মানে?

– অর্থাৎ যাকে জানা যায় তা জ্ঞেয়, যার সত্তা আছে তা প্রমেয় এবং যার নামকরণ করা যায় তা অভিধেয়। এগুলো করা গেলে তা পদার্থ। ন্যায় দর্শন অনুযায়ী পদার্থগুলির তত্ত্বজ্ঞান জীবের মোক্ষ লাভের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

যদিও ন্যায় দর্শনে ষোলোটি পদার্থের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু শুধু ষোলোটি পদার্থই এ কথা বলা হয়নি। মুক্তির উপায় হিসাবে ষোলোটি পদার্থের জ্ঞান উপযোগী এ কথাই কেবল বলা হয়েছে। প্রমাণ ও প্রমেয় কী সেটা তো তোমাকে আগে বলেছি। মনে আছে তো?

– হুঁ, মনে আছে। যে প্রণালি দিয়ে প্রমা বা যথার্থজ্ঞান লাভ করা যায় তাকেই প্রমাণ বলে।

– হ্যাঁ ঠিক; ন্যায় মতে যথার্থজ্ঞান চারপ্রকার : প্রত্যক্ষণ, অনুমিতি, উপমিতি এবং শাব্দবোধ। এই চারপ্রকার যথার্থজ্ঞানের কারণ বা প্রমাণও চারপ্রকার : প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ। কোনো কিছুর প্রকৃত জ্ঞান লাভ করার পদ্ধতিকে প্রমাণ বলা হয়। প্রমাণের মধ্যে আমরা জ্ঞানের সব উৎস পাই। আর প্রমেয়? বলতে পারবে? মনে আছে?

– প্রমেয় হলো যথার্থ অনুভব বা জ্ঞানের বিষয়।

– হুঁ, একদম ঠিক। এবার আসো সংশয় বা সন্দেহে। সংশয় হলো একপ্রকার অনিশ্চিত জ্ঞান। কোনো বস্তু ঠিক কী হবে

https://nagorikpathagar.org

নির্ণয় করতে না পেরে বস্তুটির প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে মনে যে সন্দেহ হয় তাকে সংশয় বলে।

এরপরে প্রয়োজন। নাম শুনেই বুঝতে পারছ – মানুষ যখন কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কাজে লিপ্ত হয় তাকেই প্রয়োজন বলা হয়। আমরা কোনো বাঞ্ছনীয় বিষয়কে পাওয়ার জন্য কাজ করি অথবা অবাঞ্ছনীয় জিনিস থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কাজ করি। এই দুটোই হলো আমাদের কর্মের উদ্দেশ্য। এই দুই ধরনের কর্মে প্রবৃত্ত হওয়াকে প্রয়োজন বলা হয়।

এরপরে দৃষ্টান্ত। দৃষ্টান্ত হলো প্রমাণসিদ্ধ উদাহরণ। যার সম্বন্ধে কোনো মতভেদ থাকে না, বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই যা স্বীকার করে নেয় তাকে দৃষ্টান্ত বলে।

তারপর আসে সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত হলো কোনো বিষয় সম্পর্কে শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ও প্রতিষ্ঠিত মতবাদ।

ছয়টা পদার্থ বলে ফেললাম কিন্তু। এরপর অবয়ব। অবয়ব মানে বলতে পারো আর্গুমেন্ট বা মতামতের যে স্ট্রাকচার বা গঠনকাঠামো তার একটা অঙ্গ।

প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন – এই পাঁচটি বাক্যকে ন্যায়ের অবয়ব বলা হয়। এটা নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমনির মত। একটা উদাহরণ দিই : তিনি পাহাড়ে আগুন জ্বলছে এবং ধোঁয়া হচ্ছে এই ঘটনা নিয়ে অবয়ব ব্যাখ্যা করেছেন:

১. পর্বত বহ্নিমান (প্রতিজ্ঞা)
২. কারণ, পর্বত ধূমায়মান (হেতু)
৩. যেখানে ধূম, সেখানে বহ্নি (উদাহরণ)
৪. এই পর্বতটিতে ধূম আছে (উপনয়)

https://nagorikpathagar.org

৫. অতএব এই পর্বতটি বহ্নিমান (নিগমন)

এবার আসছে তর্ক। তর্ক হলো এমন এক হাইপোথিটিক্যাল আর্গুমেন্ট যা কোনো স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিপরীত বক্তব্যকে অসম্ভব প্রমাণ করার জন্য দেখানো হয় এবং তার দ্বারা পরোক্ষভাবে মূল সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রমাণ করা হয়। এটাকে আজকে বলা হয় রিজেকশন অব নাল হাইপোথিসিস। যেমন – পর্বতে ধোঁয়া থাকলেও কেউ যদি পর্বতে আগুনের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, সেক্ষেত্রে নৈয়ায়িকরা এরূপ তর্ক প্রয়োগ করেন যে 'যদি অগ্নি না থাকে তাহলে ধূম অগ্নিজন্য না হোক'। মানে যদি আগুন না থাকে তাহলে ধোঁয়া আগুনের কারণে নয় এটা মেনে নেয়া হোক।

এরপর নির্ণয়, তা হলো এমন এক যুক্তি যার সাহায্যে এক পক্ষের মতকে বর্জন করে অপর পক্ষের মতকে গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ পরস্পরবিরোধী মতবাদ বিচার করে একটিকে বর্জন করে অপরটিকে গ্রহণ করার নাম নির্ণয়।

এরপর আসে বাদ। বাদ হলো তত্ত্বকে জানার জন্য একপ্রকার কথা বা আলোচনা। প্রমাণ ও তর্ক দিয়ে তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে আলোচনাকেই বাদ বলা হয়। যেমন আত্মার অস্তিত্ব আছে আবার নেই, দুটো সিদ্ধান্তই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে আত্মার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করার জন্য যে আলোচনা তাই হলো বাদ।

– তাহলে আমরা যে আলোচনা করছি সেটা কি 'বাদ'।

– উহুঁ, এটাকে বাদ বলা যাবে না। কারণ আমরা তো তর্ক করছি না, প্রমাণও দাখিল করছি না। তাই না?

এরপরে আছে খুব ইন্টারেস্টিং একটা টার্ম জল্প। আমরা যে

https://nagorikpathagar.org

জল্পনা কথাটা ব্যবহার করি সেটা এখান থেকেই এসেছে। এর মানে হচ্ছে কেবলমাত্র প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার জন্য যে নিছক বাক্‌যুদ্ধ চলে, তাকেই বলা হয় জল্প। সোজা কথায়, জল্প সেই আলোচনা যার লক্ষ্য তত্ত্বজ্ঞান নয়, যার একমাত্র লক্ষ্য জয়লাভ করা।

এরপরে বিতণ্ডা। এটাও কোনো তত্ত্বালোচনা নয়। আমরা বলি না বাক্‌বিতণ্ডা? এই বিতণ্ডা হলো একধরনের যুক্তিহীন তর্ক। এক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিজের মত প্রতিষ্ঠা না করে অপরের মতকে খণ্ডন করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ বিতণ্ডা হলো একপ্রকার আলোচনা যার লক্ষ্য তত্ত্বজ্ঞান নয়, জয়লাভ করাও নয়, যার একমাত্র লক্ষ্য প্রতিপক্ষকে খণ্ডন করা। জল্প থেকে বিতণ্ডা আলাদা এটা বুঝতে পারছ তো? এটাকে আজকের যুগে বলা হয় 'তেনাপেচানি'।

– পারছি বলে মনে হচ্ছে। হি হি হি!

– ঠিক আছে। এবার আসছে হেত্বাভাস। হেত্বাভাস আসলে হেতু বা যুক্তি নয়, অথচ হেতুর আভাস বা হেতু বা যুক্তির মতো দেখায়। হেত্বাভাস অনুমান হচ্ছে অনুমানের হেতু বা কারণ সংক্রান্ত দোষ। এরকম দোষযুক্ত হেতুতে যুক্তি হেত্বাভাস দোষদুষ্ট হয়। একটু কঠিন হয়ে গেল, না?

– কিছুটা। তবে বলো।

এরপরে আরো ইন্টারেস্টিং পদার্থ সেটা হচ্ছে 'ছল'। কথায় আছে না দুর্জনের ছলের অভাব হয় না। বক্তা যে অর্থে একটি শব্দ বা বাক্য প্রয়োগ করেন, প্রতিপক্ষ যদি সেই শব্দ বা বাক্যের অন্য অর্থ কল্পনা করে বক্তার বক্তব্যের দোষ দেখান, তাহলে তাকে বলা হয় ছল।

https://nagorikpathagar.org

এবার হচ্ছে জাতি। জাতি মানে কিন্তু ন্যাশন না। জাতি হলো মিথ্যা সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে অযথার্থ উত্তর প্রদান। এই জাতি আবার আঠারো রকম। শুনবে?

– না না, দরকার নেই। মাথা ঘুরাচ্ছে এই শুনেই।

– আচ্ছা ঠিক আছে; এবার ফাইনালি নিগ্রহস্থান। নিগ্রহের মানে হচ্ছে বিতর্কে পরাজয়ের হেতু বা কারণ। প্রতিপক্ষ যদি যুক্তি দিয়ে তোমার কথা খণ্ডন করতে না পারে বা প্রতিপক্ষের নিজ মত খণ্ডিত হওয়ার ফলে তাকে আবারো যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে তবে যেই কারণে সে তর্কে হারলো সেই কারণকে বলা হবে নিগ্রহস্থান।

– তার মানে যে জায়গায় এসে তর্কে পরাজয় হয় সেটাই তো নিগ্রহস্থান, তাই না?

– হুঁ, একদম ঠিক। বিচারে পরাজয়ের কারণ নানাভাবে হতে পারে। ভ্রমাত্মক জ্ঞান অথবা অজ্ঞানতাই পরাজয়ের কারণ। তবে জেনে রেখো, 'জ্ঞান' শব্দটি কখনো ব্যাপক অর্থে কখনোবা সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার হয়। ভারতীয় দার্শনিকেরা 'জ্ঞান' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। এই অর্থে তারা মিথ্যা জ্ঞানের কথাও বলেছেন।

– আচ্ছা, পদার্থের আলোচনা তো শেষ হলো। এবার ওই যে বলেছিলে ন্যায় দর্শনের জ্ঞানতত্ত্ব বা এপিসটেমোলজি আলোচনা করবে।

– হুঁ। ন্যায়-জ্ঞানতত্ত্ব ন্যায় দর্শনে বস্তুতত্ত্ব জ্ঞানতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এই দর্শনে জ্ঞানের সংজ্ঞা, জ্ঞানের প্রকারভেদ, যথার্থ জ্ঞান ও অযথার্থ জ্ঞানের প্রকৃতি কী এবং এদের মধ্যে

https://nagorikpathagar.org

পার্থক্য কী তা বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। ন্যায় দর্শন মতে জ্ঞান গুণপদার্থ। এই গুণ হলো আত্মার গুণ। জ্ঞান ও বুদ্ধি এই দর্শনে সমার্থক।

'যে পদার্থটি সকল ব্যবহারের প্রতি কারণ, সেই গুণস্বরূপ পদার্থই জ্ঞান। এবং জ্ঞান বুদ্ধির নামান্তর বা বুদ্ধি জ্ঞানের নামান্তর; যা বুদ্ধি, তাই জ্ঞান; যা জ্ঞান তাই বুদ্ধি। বুদ্ধি ও জ্ঞান অভিন্ন।' এটাই কিন্তু ইউরোপের কান্টের কথা। জ্ঞান আবার দুই রকম প্রমা আর অপ্রমা।

প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানকে উৎস অনুযায়ী চার ভাগে ভাগ করা হয় – প্রত্যক্ষণ (Perception), অনুমান (Inference), উপমান (Comparison) ও শব্দ (Testimony)।

অপ্রমা (Non-veridical *anubhava*) : কোনো বস্তুতে যে-গুণ আছে বলে আমরা জানি সে-গুণ সেই বস্তুতে যখন প্রকৃতপক্ষে নেই, এ ধরনের জ্ঞানকে অপ্রমা বা অযথার্থ জ্ঞান বলা হয়। যেমন, দড়ি দেখে কেউ যদি সাপ মনে করে সেই জ্ঞান হলো ভ্রান্তজ্ঞান। দড়ির মধ্যে সাপের গুণ উপলব্ধি করা হয় কিন্তু আসলে দড়ির মধ্যে সাপের গুণ বর্তমান নেই। একটি বস্তুর মধ্যে বিপরীত গুণের সমাবেশ থাকলে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। সন্দেহ বা সংশয় যেখানে থাকে সেখানে জ্ঞান যথার্থ হতে পারে না, তখন সেটা হয় অনিশ্চিত জ্ঞান। ভ্রম যথার্থ জ্ঞান নয়, কারণ ভ্রমে বিষয়ের যথার্থ অনুভব হয় না। দড়িকে সাপ বলে প্রত্যক্ষ করা হয়। এই ধরনের প্রত্যক্ষণ ভ্রমাত্মক, কেননা এই প্রত্যক্ষণে বস্তুর যথার্থ অনুভব হয় না।

অপ্রমাকেও চার ভাগে ভাগ করা হয় – স্মৃতি (Memory), সংশয় (Doubt), ভ্রম (Illusion), এবং তর্ক (Hypothetical

https://nagorikpathagar.org

Argument)।

ন্যায় দর্শনই কিন্তু বলে তর্কের দ্বারা বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান পাওয়া যায় না। তর্ক প্রমাণের সহায়ক মাত্র। প্রমাণের সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, সেই সিদ্ধান্তের বিপরীত-মতকে অসম্ভব বলে প্রমাণ করার জন্য যে যুক্তি দেখানো হয় তাকে তর্ক বলে। তাহলে আমরা এখন ডেটা বা উপাত্ত দিয়ে বিজ্ঞানের যে কাজ চালাই সেখানে ভারতীয় দর্শন সম্পূর্ণ অন্য পথে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার পথ দেখিয়েছে। তর্কের মাধ্যমে প্রমাণে উপস্থিত হওয়া।

– তাহলে কি আমরা আগের সেই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি না?

– নিশ্চয় পারি। কিছু ক্ষেত্রে তো ব্যবহার করাই হয়। যেমন ধরো, যখন কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা বা কথাবার্তা বলা হয় সেটাও তো এই তর্ক-পদ্ধতি ব্যবহার করেই করা হয়, তাই না? আমাদের দেখতে হবে কোথায় কোথায় আমরা এখনো এটাকে প্রযুক্ত করতে পারি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কিসের উপর নির্ভর করে জ্ঞান যথার্থ, না অযথার্থ তা বিচার করা যায়? জ্ঞানের সত্যতা ও অসত্যতা নির্ণয় করার মাপকাঠি কী? নৈয়ায়িকদের মতে প্রবৃত্তিসামর্থ্যই হলো জ্ঞানের সত্যতার নির্ধারক। কর্মের সফলতা (প্রবৃত্তিসামর্থ্য বা প্রবৃত্তি সংবাদ) ও কর্মের বিফলতা (প্রবৃত্তি বিসংবাদ) – এ দুয়ের সাহায্যে জ্ঞানের সত্যতা এবং জ্ঞানের অসত্যতা প্রমাণ করা যায়। 'প্রবৃত্তিসামর্থ্য' মানে বুঝতে পারছো নিশ্চয়। সেটা হচ্ছে যা জেনেছ সেটা দিয়ে যদি তোমার কাজ হয় তবে সেটা প্রবৃত্তিসামর্থ্য। কোনো বস্তুকে 'চিনি' বলে খেয়ে যদি কোনো

https://nagorikpathagar.org

ব্যক্তি মিষ্ট স্বাদ পায় তাহলে ঐ ব্যক্তির প্রবৃত্তি সমর্থ বা সফল হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। কিন্তু কোনো জিনিসকে 'চিনি' বলে খেয়ে কোনো ব্যক্তি যদি নোনা স্বাদ লাভ করে তাহলে তার প্রবৃত্তি সফল হয় না। প্রবৃত্তি সফল না হলে জ্ঞানটিকে প্রমা বলা যায় না।

এখানে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ভারতীয় দার্শনিকেরা সামনে এনেছেন সেটা হচ্ছে চর্চা। শুধু তত্ত্ব নয়, সেটাকে চর্চার মধ্য দিয়ে মূর্ত করে তুলতে হবে। এই থিওরি অ্যান্ড প্র্যাক্টিসের কথা ইউরোপ শুনেছে অনেক পরে, কার্ল মার্ক্সের কাছে।

এবার বাকি থাকল ন্যায় পরাতত্ত্ব বা মেটাফিজিক্স। তোমার মনে আছে মেটাফিজিক্স কী? এটা কিন্তু এই আলাপ শুরুর আগেই বলেছিলাম।

– হুঁ। মেটাফিজিক্স অধ্যাত্ম অনুসন্ধান করে।

– ঠিক। ন্যায় দর্শন অনুসারে জগতের স্বতন্ত্র সত্তা আছে। তাই জাগতিক বস্তুরও স্বতন্ত্র সত্তা আছে, সেগুলো নিছক মনের ধারণা নয়। ফলে এদের অস্তিত্ব জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল নয়। নৈয়ায়িকেরা দ্বৈতবাদী। তারা জড়জগৎ ও আত্মা উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন। আত্মা বলতে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়কেই বোঝায়। ন্যায়মতে ঈশ্বরই পরমাত্মা, তাই সাধারণভাবে আত্মা বলতে জীবাত্মাকেই বোঝানো হয়। নৈয়ায়িকদের মতে আত্মা একটি অভৌতিক, নিত্য ও সর্বব্যাপী দ্রব্য। দেশ ও কাল আত্মাকে সীমিত করতে পারে না। তাঁদের মতে এক একটি দেহে এক একটি আত্মা বিদ্যমান। আত্মা জ্ঞানের অধিকরণ বা আশ্রয়।

– তাহলে আত্মা মানেই জ্ঞান নয়?

https://nagorikpathagar.org

– না, আত্মা জ্ঞান বা চৈতন্য নয়। জ্ঞানের ধারণ হচ্ছে আত্মার লক্ষণ। জ্ঞান বা চৈতন্য আত্মার একটি গুণ। ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় মতেই আত্মা জ্ঞান ও ইচ্ছাদি (ইচ্ছা, দ্বেষ, বুদ্ধি বা প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি) গুণের আশ্রয়। তবে জ্ঞান আত্মার নিত্য গুণ নয়, আগন্তুক গুণ।

– মানে?

– মানে তো সহজ। আগন্তুক মানে হঠাৎ করে যে হাজির হয়। আত্মাতে জ্ঞান সবসময় থাকে না। আত্মাতে হঠাৎ করেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞান, চৈতন্য বা ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ আত্মা বা আত্মদ্রব্যের বিশেষ গুণ। এই গুণগুলি অভৌতিক। এর ফলে কোনো ভৌতিক দ্রব্যে এই গুণগুলি থাকতে পারে না। গুণের আলাদা অস্তিত্ব থাকে না, গুণ দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে। অর্থাৎ যে কোনো গুণ কোনো-না-কোনো দ্রব্যকে আশ্রয় করে অবস্থান করে। রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি গুণ যেহেতু ভৌতিক নয়, তাই এই গুণগুলি কোনো অভৌতিক দ্রব্যকে আশ্রয় করেই অবস্থান করে। এই অভৌতিক গুণগুলির আশ্রয়রূপে যে অভৌতিক দ্রব্য, সেটাই আত্মা।

– আচ্ছা, আত্মা নিয়ে তো নানা দর্শন নানা কথা বলেছে, তাই না?

– হুঁ। ভারতীয় বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে জীবাত্মার স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চারটি মতবাদ হলো – জড়বাদী, অভিজ্ঞতাবাদী, ভাববাদী ও বস্তু স্বাতন্ত্র্যবাদী। জড়বাদী দার্শনিক সম্প্রদায় চার্বাকদের মতে, চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা, দেহ ছাড়া আত্মার ভিন্ন কোনো সত্তা নেই এবং অভৌতিক আত্মা বলে কিছু নেই, অর্থাৎ আত্মা

https://nagorikpathagar.org

এবং দেহ অভিন্ন। চার্বাকমতে দেহ বিনষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও বিনষ্ট হয়, তাই আত্মা অমর নয়। অভিজ্ঞতাবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে আত্মা – ওরা ঠিক আত্মা এই শব্দ ব্যবহার করে না; বলে, পুৎগল – এই পুৎগল হলো পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থা। ভাববাদী অদ্বৈত বেদান্তমতে আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ও নিত্য। এই মতে আত্মা জ্ঞাতাও নয়, জ্ঞেয়ও নয়। মানে আত্মাকে জানাও যায় না, আবার আত্মা কিছু জানতেও পারে না। আর রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত মতে আত্মা চৈতন্যস্বরূপ নয়, আত্মা হলো সক্রিয় ও সগুণ সচেতন দ্রব্য।

– তাহলে ন্যায় দর্শন আত্মা সম্পর্কে কী বলে?

– নৈয়ায়িকেরা আত্মাকে একটি চৈতন্যবিশিষ্ট দ্রব্য বলে মনে করেন। তাঁদের মতে আত্মা জ্ঞাতা, ভোক্তা ও কর্তারূপে সব কিছু জানে। আত্মা সকল কর্ম সম্পাদন করে এবং সকল কিছু ভোগ করে। তবে ন্যায়মতে চৈতন্য বা জ্ঞান আত্মার বিশেষ গুণ হলেও তা আত্মার স্বাভাবিক বা অবিচ্ছেদ্য গুণ নয়। তোমাকে আগেই বলেছি জ্ঞান বা চৈতন্য আত্মার আগন্তুক গুণ, যা কিছু সম্বন্ধের মাধ্যমে আত্মায় আশ্রিত হয়। আত্মা স্বরূপত অচেতন, নিষ্ক্রিয়। আত্মা যখন মনের সঙ্গে, মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এবং ইন্দ্রিয় বাহ্যবস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়, তখন আত্মার চেতনা বা বুদ্ধির আবির্ভাব হয়। এই সম্বন্ধগুলির অভাবে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। আবার আত্মা যখন দেহ বিযুক্ত হয় তখন তাতে আর চৈতন্যরূপ থাকে না। আত্মার মুক্তি বা মোক্ষাবস্থায় আত্ম-মন-সংযোগ না থাকায় আত্মায় জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না এবং আত্মা জ্ঞানহীন শুদ্ধ সত্তারূপে বিরাজ করে। কিন্তু এই জ্ঞানহীন শুদ্ধসত্তাবদ্ধতা আত্মারই আরেক অবস্থা। বদ্ধাবস্থায় আত্মা জ্ঞানের অধিকারী হয়। এজন্য মুক্ত আত্মাকে জ্ঞানহীন

https://nagorikpathagar.org

বলা যায়।

– আত্মার মুক্তি বা মোক্ষ কীভাবে হয়?

– আত্মার মোক্ষলাভকে ন্যায়ের পরিভাষায় বলা হয় অপবর্গ। চার্বাক ব্যতীত প্রায় সকল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়েরই মূল লক্ষ্য হলো আত্মার মুক্তি। বৌদ্ধ মতে যদিও স্থায়ী আত্মা স্বীকার করা হয়নি, তবু তাদেরও মূল লক্ষ্য চৈতন্য-প্রবাহের নির্বাণ।

ন্যায় মতে আত্মা স্বভাবতই নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ ও চৈতন্যহীন দ্রব্য। আত্মা মনের সঙ্গে যুক্ত হলে এবং মন, ইন্দ্রিয় ও বাহ্যবস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হলেই বুদ্ধি, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, প্রযত্ন প্রভৃতি গুণ আত্মার মধ্যে আবির্ভূত হয়। মন ও দেহের সঙ্গে আত্মার এই সংযোগ ঘটলে আত্মার বদ্ধাবস্থা সূচনা করে। এর ফলে এই বদ্ধ-আত্মারূপ দেহ সুখ-দুঃখাদি ভোগ করে। ন্যায় মতে এই সুখ-দুঃখাদি ভোগের মুক্তি বা নিবৃত্তিই হলো মোক্ষ বা অপবর্গ। মূলত মুক্তি বলতে নৈয়ায়িকেরা বৌদ্ধদের মতো দুঃখের নিবৃত্তিকেই বোঝান। দুঃখের নিবৃত্তি হলে তার আর পুনরাবৃত্তি হয় না।

– কী কারণে দুঃখ হয়?

– মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যা হেতু দুঃখ হয়।

– তাহলে অবিদ্যা কী?

– অনিত্যবস্তুকে নিত্য মনে করাই অবিদ্যা। যেমন আমরা মন, ইন্দ্রিয়, শরীর প্রভৃতিকেই আত্মারূপে মনে করি। কিন্তু আত্মা মন, শরীর ও ইন্দ্রিয় – এর কোনোটির সঙ্গেই অভিন্ন নয়। এই ভ্রান্ত জ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞান। অজ্ঞানতাবশত মানুষ নিজেকে কর্তা,

https://nagorikpathagar.org

জ্ঞাতা এবং ভোক্তা মনে করে। আত্মাকে সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতির অধীন মনে করে মোহগ্রস্ত হয়। আত্মাকে এরূপ মনে করাই অবিদ্যা। এই অবিদ্যা বা মিথ্যজ্ঞান থেকে তিন প্রকার দোষ জন্মে – রাগ, দ্বেষ ও মোহ। এই দোষের তাড়নায় জীব ভালো-মন্দ কাজে লিপ্ত হয়। এর ফলে ধর্ম ও অধর্মের উৎপত্তি হয়। এই প্রবৃত্তির জন্য মানুষের আবার জন্ম হয় এবং এই জন্ম হেতু দুঃখ হয়।

– আবার জন্ম মানে?

– কর্মফলবাদ তথা জন্মান্তরবাদ অনুযায়ী জীবের ধর্মাচরণের ফলস্বরূপ সুখ ভোগ করার জন্য এবং অধর্মাচরণের ফলস্বরূপ দুঃখ ভোগের জন্যই জীবকে বারবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। জীবের জন্য এই জন্মগ্রহণই মূলত সকল দুঃখের কারণ। ন্যায়মতে, সকল দুঃখের মূল যে মিথ্যাজ্ঞান, সেই মিথ্যাজ্ঞান যথার্থ জ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হলে জীবকে আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না। সেই জন্মরূপ হচ্ছে দুঃখ, সেই দুঃখের সাথে বিমুক্তি ঘটাই পূর্ণমুক্তি। তাই জন্ম একটা অশুচি-অপবিত্র বিষয়। সে-কারণেই আগে আঁতুড়ঘর বলে একটা ঘর থাকত, যেটা মূল বসতবাটি থেকে আলাদা এবং যেখানে গিয়ে মায়েরা সন্তান জন্ম দিত।

– তাহলে ন্যায় দর্শন শেষ?

– শেষ, তবে নব্য ন্যায় আছে। ভুলে গেছো?

– ও হো! ভুলেই গেছি। বলো, সেটা আবার কী।

– নব্য ন্যায়ের প্রধান বিচার্য প্রমাণের সংখ্যা এবং সেগুলোর প্রকৃতি। এটুকুই বলি। এটা বলতে গেলে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে

https://nagorikpathagar.org

পারো। তবে হ্যাঁ, মোটামুটি সব আলাপই আমরা করেছি। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো আরো গভীরে গিয়ে আলাপ সম্ভব। মূল দার্শনিক প্রশ্নের বাইরে অনেক আলাপই বাদ দেয়া হয়েছে। সেটা যদি জানতে চাও তবে তোমাকে আরো গভীরে প্রবেশ করতে হবে। আরো অনেক অনেক পড়তে হবে। রাজি আছো?

– দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত যাই তো আগে। তারপর বলব।

https://nagorikpathagar.org

কয়েকদিন বাদ রেখে আবার আমাদের বসার সুযোগ হলো।

– এবার কি মীমাংসা দর্শন?

– হ্যাঁ, পূর্ব আর উত্তর মীমাংসা।

– আচ্ছা মীমাংসা নাম হলো কেন? ঝগড়াঝাঁটি থামানোর জন্য নাকি?

– হা হা হা, অনেকটা তাই। ধরো শাস্ত্রে বলছে 'মা হিংস্যাৎ'। মানে হিংসা করবে না, এটা মানলে তো প্রাণী বধ করা যায় না। আবার আরেক জায়গায় বলা হয়েছে 'গাং আলভেত' মানে হচ্ছে গরু মারিবে।

– মানে গরু কতল করার কথা লেখা আছে?

– হুঁ, আছে। অনেক জায়গাতেই আছে। হিন্দুদের গরু খাওয়া বন্ধ হয়েছে অনেক পরে। সেটা পরের আলাপ।

– আচ্ছা, বলো।

https://nagorikpathagar.org

– কোথাও বলা আছে 'উদিতে জুহুয়াৎ' মানে সূর্য উঠিবার আগে হোম করিবে। আবার পরক্ষণেই বলা হয়েছে 'অনুদিতে জুহুয়াৎ' মানে সূর্য উঠিবার আগে হোম করিবে না। এই রকম দুইটা পরস্পর বিরোধী উক্তি তো একসাথে পালন করা চলে না। সুতরাং মীমাংসা প্রয়োজন। এই থেকে মীমাংসা শাস্ত্রের উৎপত্তি। মীমাংসাতে দর্শনের বাইরের বিষয় আছে আবার দর্শনের বিষয়ও আছে। মীমাংসার আবার দুইভাগ আছে, বলেছি। পূর্ব মীমাংসায় বৈদিক যাগযজ্ঞের ব্যাখ্যা রয়েছে এবং উত্তর মীমাংসায় ব্রহ্ম, জগৎ ও আত্মার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

– মীমাংসা তাহলে খাঁটি দর্শন নয়?

– হুঁ, তাই। এর প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মের ব্যাখ্যা করা। ধর্ম মানে বেদের ধর্ম। বেদে রাজসুয়, অশ্বমেধ যজ্ঞ থেকে শুরু করে ছোট-বড় নানা ধরনের কর্মের উপদেশ আছে, এদের ফলও বর্ণনা করা আছে। এই সকল ধরনের বিধি, উদ্দেশ্য ও ফল বর্ণনা করাই মীমাংসার প্রধান কাজ। বিশ্বের ব্যাখ্যা, দর্শনের কথা, আত্মা, জগৎ তাদের কাছে অবান্তরই হবার কথা, তবুও সেই আলাপ মীমাংসকেরা করেছেন, সেই যুক্তিতেই এটা দর্শনের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়।

মীমাংসা দর্শনের প্রাচীনতম ও মূল গ্রন্থ হলো জৈমিনির 'মীমাংসাসূত্র'। জৈমিনির রচনা বলেই মীমাংসাসূত্রকে 'জৈমিনিসূত্র'ও বলা হয়ে থাকে। মীমাংসা শাস্ত্রের আলোচনার বিষয় বিস্তৃত। প্রমাণ, প্রমেয়, ধর্ম, শব্দের নিত্যতাবাদ, বেদের অপৌরুষেয়তা, মন্ত্র, বিধি, কর্মানুষ্ঠান, যজ্ঞাদির অধিকার, বাক্যার্থ বিচার, অর্থবাদ, স্বর্গ, নরক, অপূর্ব, নিরীশ্বরবাদ, মোক্ষ – এ সবই মীমাংসা শাস্ত্রের আলোচিত বিষয়।

https://nagorikpathagar.org

মীমাংসা দার্শনিকেরা মূলত বেদের প্রামাণ্য প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যেই জ্ঞানের স্বরূপ, যথার্থ ও অযথার্থ জ্ঞানের পার্থক্য নির্ণয়, যথার্থ জ্ঞান লাভের উপায় এবং এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। মীমাংসা দর্শন মতে, সমস্ত বস্তুই হয় প্রমাণ অথবা প্রমেয়ের অন্তর্গত। তুমি তো এর মধ্যেই জেনেছ, প্রমাণ হলো প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের কারণ বা উপায়, আর প্রমেয় হলো যথার্থ জ্ঞানের বিষয়।

– হু, মনে আছে।

– মীমাংসা দর্শনে প্রমাণ নিয়ে আলোচনার মূলে প্রকৃত উৎসাহ আসলে বেদের প্রামাণ্য প্রতিপন্ন করা। মীমাংসকদের প্রধানতম প্রতিপাদ্য হলো বেদ অপৌরুষেয় এবং নিত্য। অবশ্য তাঁরা বেদ বলতে বেদের যাগযজ্ঞ বা ক্রিয়াকর্মের বিধি-নিষেধ এবং বিধি-নিষেধের প্রশংসা এটুকুই বিবেচনা করেছেন। কিন্তু মীমাংসকেরা এটা অনুভব করেছিলেন যে, ইহজগতের কোনো কাজে না আসলে যাগযজ্ঞ অর্থহীন। সে-কারণে তাঁরা ভাববাদ খণ্ডন করে বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। যেহেতু ভাববাদীরা ভাববাদের সমর্থনে প্রধানত প্রমাণাশ্রিত যুক্তির উপর নির্ভর করেন, তাই ভাববাদ-খণ্ডনে মীমাংসকেরা প্রমাণতত্ত্বের বিচারে সময় দিতে বাধ্য হয়েছেন।

সাধারণভাবে প্রমাণতত্ত্বের আলোচনায় প্রথমে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন ওঠে – প্রমার লক্ষণ কী, প্রামাণ্যের ব্যাখ্যা কী, ভ্রমের ব্যাখ্যা কী? ফলে মীমাংসকেরাও এই মৌলিক প্রশ্নগুলি বিচার করেছেন। প্রমাণ হচ্ছে সেই জ্ঞান যা দৃঢ়ভাবে উৎপন্ন হয় এবং অন্যজ্ঞানের দ্বারা সংবাদপ্রাপ্ত হয় না, সেই জ্ঞানই এইমতে প্রমাণ বা প্রমা। সহজ কথায়, ভাট্ট মতে, যে জ্ঞানে কোনো অজ্ঞাত বা অনধিগত বিষয়ের জ্ঞান হয় এবং যে জ্ঞান

https://nagorikpathagar.org

অন্য জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় না তা-ই প্রমা।

– বুঝলাম না, আরেকটু বুঝিয়ে বলো।

– পূর্বে অজ্ঞাত কোনো বিষয় সম্পর্কে সম্যক পরিচয় হলো প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান। এই যথার্থ জ্ঞান অন্য কোনো জ্ঞানের দ্বারা বাধিত বা মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে না। প্রমা ও প্রমাণের প্রকার বা সংখ্যা নিয়ে ভারতীয় দর্শনে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করেছেন। চার্বাকপন্থি লোকায়ত সম্প্রদায় কেবল ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষজ্ঞানকেই যথার্থ বলে মানেন। বেদবিরোধী আস্তিক বৈশেষিক এবং বেদবিরোধী নাস্তিক বৌদ্ধ দর্শনে প্রত্যক্ষের পাশাপাশি দ্বিতীয় প্রমাণ হিসেবে অনুমানকেও স্বীকার করা হয়। আরেক প্রমাণদ্বৈবিধ্যবাদী শব্দাদ্বৈতী পাণিনিদর্শনে অনুমানের বদলে স্থান দেয়া হয়েছে আগম বা শাব্দপ্রমাণকে। আবার সাংখ্য দার্শনিকদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বেদান্তীদের অধিকাংশ সম্প্রদায় ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে ত্রিবিধ প্রমাণ হলো প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম বা শাব্দপ্রমাণ। এদিকে উপমান অর্থাৎ সাদৃশ্যের জ্ঞানকে যুক্ত করে নৈয়ায়িকেরা স্বীকার করেন চতুর্বিধ প্রমাণ – প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং আগম বা শাব্দপ্রমাণ।

মীমাংসার দুই প্রসিদ্ধ সম্প্রদায় কুমারিল ভট্ট প্রবর্তিত ভাট্টপ্রস্থান এবং প্রভাকর মিশ্র প্রবর্তিত প্রাভাকর-প্রস্থানে ন্যায়সম্মত চারটি প্রমাণের সাথে অর্থাপাত্তি নামে পঞ্চম একটি প্রমাণকে স্বীকার করা হয়েছে। অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনেও এই পঞ্চবিধ প্রমাণ স্বীকৃত – প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ বা আগম এবং অর্থাপত্তি। তবে এই পঞ্চবিধ প্রমাণের সাথে মীমাংসকেরা ষষ্ঠ প্রমাণ হিসেবে জুড়ে দিয়েছেন অনুপলব্ধি বা অভাবপ্রমাণকে। অর্থাৎ ভাট্টমীমাংসক মতে প্রমাণ ছয় প্রকার – প্রত্যক্ষ,

https://nagorikpathagar.org

অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি। এই ছয় ধরনের প্রমাণ আমরা একদম শুরুতেই আলোচনা করেছি। মনে আছে তো?

– হুঁ, মনে আছে। তবে সেখানে তুমি এগুলোকে জ্ঞান অর্জনের পথ বলেছিলে।

– হ্যাঁ, তবে এটা খেয়াল রাখতে হবে যে, মীমাংসা দর্শনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিবেচনায় এই দর্শনে সর্বাপেক্ষা দৃঢ় প্রমাণ হলো শাব্দপ্রমাণ বা বেদ।

– মীমাংসার জ্ঞানতত্ত্বটা কী?

– প্রথম বিবেচ্য কী কী কারণ থেকে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মীমাংসকেরা বলেন, একাধিক কারণ থেকে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাহলে জ্ঞান হচ্ছে কার্যস্বরূপ। আর প্রামাণ্য তার শক্তি বা সামর্থ্য।

ভারতীয় দর্শনে প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য নিয়ে যে বিতর্কগুলো হয়েছে সেই বিতর্কের মূলে প্রধানত দুটি প্রশ্ন আছে। প্রথমত, প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্যের উৎপত্তির ব্যাখ্যা কী? যে-কারণে জ্ঞানের উৎপত্তি সেই কারণেই কি প্রামাণ্য বা অপ্রামাণ্যের উৎপত্তি? নাকি, প্রামাণ্য বা অপ্রামাণ্যের উৎপত্তি স্বতন্ত্র বা বাইরের কোনো কারণে হয়? দ্বিতীয়ত, প্রামাণ্য বা অপ্রামাণ্যের অবগতিই-বা হয় কী করে?

– অবগতি মানে?

– মানে হচ্ছে, এই প্রামাণ্য বা অপ্রামাণ্যের কথা কেমন করেই-বা জানা যায়? এখানেই আসছে স্বতঃ-প্রামাণ্যবাদ ও পরতঃ-প্রামাণ্যবাদ। প্রমাণ ও জ্ঞান যদি একই কারণ থেকে উদ্ভূত

https://nagorikpathagar.org

https://nagorikpathagar.org

হয় তাহলে সেটা স্বতঃ-প্রামাণ্যবাদ বা Theory of Intrinsic Validity। আর জ্ঞান ও প্রমাণ যদি আলাদা আলাদা কারণ থেকে উৎপন্ন হয় তাহলে সেটা পরতঃ-প্রামাণ্যবাদ বা Theory of Extrinsic Validity।

অপ্রামাণ্য প্রসঙ্গেও এ জাতীয় দুটি মতবাদ আছে – স্বতঃ-অপ্রামাণ্যবাদ ও পরতঃ-অপ্রামাণ্যবাদ।

স্বতঃ-অপ্রামাণ্যবাদ বা Theory of Intrinsic Invalidity আর পরতঃ-অপ্রামাণ্যবাদ বা Theory of Extrinsic Invalidity।

– তাহলে কোন কোন দর্শনে ভ্যালিডিটির প্রশ্ন কীভাবে এসেছে?

– সাংখ্য দার্শনিকদের মতে জ্ঞানের প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য – উভয়ই স্বতঃ। নৈয়ায়িক মতে জ্ঞানের প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য উভয়ই পরতঃ। বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে জ্ঞানের অপ্রামাণ্য হলো স্বতঃ, কিন্তু জ্ঞানের প্রামাণ্য হলো পরতঃ। মীমাংসা মতে জ্ঞানের প্রামাণ্য হলো স্বতঃ, কিন্তু অপ্রামাণ্য হলো পরতঃ।

– কিন্তু, এই ভ্যালিডিটির প্রশ্নটা কোন কাজে আসে?

– এখানে অপ্রামাণ্যবাদের উদাহরণ দিয়ে দেখা যাক। অপ্রামাণ্য বা intrinsic invalidity যদি স্বতঃসিদ্ধ হয় তাহলে স্বীকার করতে হবে যে জ্ঞানমাত্রই ভ্রম বা মিথ্যা। জ্ঞানমাত্রেই স্বতঃসিদ্ধভাবে মিথ্যা হতে বাধ্য। তাহলে জগতে সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম।

– কেন? বুঝলাম না। আরো একটু বুঝিয়ে দাও।

– প্রমাণ ও জ্ঞান যদি একই কারণ থেকে উদ্ভূত হয় তাহলে সেটা স্বতঃ-প্রামাণ্যবাদ, তাই তো? তাহলে জ্ঞান ও অপ্রামাণ্য যদি একই উৎস থেকে উদ্ভূত হয় তবে সেটা স্বতঃ-অপ্রামাণ্যবাদ। তাই না? অপ্রামাণ্য আর জ্ঞান যদি একই উৎস থেকে উদ্ভূত হয়

তাহলে জ্ঞান মিথ্যা বা ভ্রম হয়ে যাচ্ছে না?

– হুঁ, ঠিক।

– দর্শনতত্ত্বে জগতের সকলকিছুই কিন্তু এই প্রমাণ ও প্রমেয়ের অন্তর্গত। যে মতবাদে জগতের সমস্ত জ্ঞানকে মিথ্যে বলে ঘোষণা করা হয়, আপাতদৃষ্টিতে মতবাদটিকে অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু ভাববাদী দার্শনিকের পক্ষে এ জাতীয় মতবাদের প্রস্তাব অস্বাভাবিক নয়। কারণ, ভাববাদী দার্শনিকদের মতে বহির্জগৎ বলে কিছু নেই, বাইরের বস্তু বলে কিছু নেই। আমাদের সাধারণ ধারণা বা বিশ্বাস বলতে যে বাইরের জগতের বিশ্বাস বুঝি, ভাববাদীদের মতে তা হলো যা নেই তারই বিশ্বাস। অবস্তুতে বস্তুর বিশ্বাস। অতএব এ সব মিথ্যা। এটুকু বুঝলে তুমি মায়াবাদ বুঝবে। সেটায় আসবো।

আরেকটা মজার বিষয় কি জানো যে মীমাংসায় ঈশ্বরের স্বীকৃতি নেই!

– তাহলে এটা আস্তিক দর্শন হয় কীভাবে?

– এইরে আবারো গুলিয়ে ফেললে? আস্তিক-নাস্তিক তো ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরের বিশ্বাসের সাথে যুক্ত নয়। যুক্ত হচ্ছে বেদ স্বীকার করে, নাকি করে না তার সাথে।

– অহ, ভুলে গিয়েছিলাম! ঈশ্বর স্বীকার করে না কেন মীমাংসা?

– মীমাংসা বলে, জগৎ অনাদি সুতরাং অনাদি হলে তো স্রষ্টার দরকার নেই। অনাদি মানে যার কোনো আদি নাই বা সৃষ্টি নেই। আর মীমাংসা মনে করে 'কর্ম' আপনার ফল আপনি দিতে পারে, সুতরাং কর্মফল-দাতা হিসেবে ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই।

https://nagorikpathagar.org

মীমাংসা দর্শনে কিন্তু স্বর্গ বলে কোনো স্থান নেই। স্বর্গ একটা অবস্থা; অনাবিল আনন্দ থাকা এবং দুঃখের একান্ত অভাবই স্বর্গ।

– আচ্ছা। তাহলে দেবতাদের বিষয়ে মীমাংসা কী বলে?

– মীমাংসকদের একাংশ মনে করেন দেবতাদের যজ্ঞে অধিকার নেই। কারণ তাদের উপরে এমন কেউ নেই যাকে তুষ্ট করতে হবে। কিন্তু বেদান্তে দেবতাদের যজ্ঞে অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। প্রলয় বা কেয়ামত সম্পর্কে মীমাংসা বলে যে, জগৎ যেহেতু অনাদি ও বিনাশহীন তাই প্রলয় মানেও ধ্বংস নয়। ছবি যেমন গুটিয়ে রাখা যায় আবার গোটানো ছবি খুলে ফেললে আবার আগের মতোই দেখা যায় প্রলয়ও তাই। প্রলয়ের শেষে জগৎ যেমন ছিল তেমনি ফিরে আসে।

আত্মা সম্পর্কে মীমাংসকেরা বলেছে আত্মা বহু ও অমর। কর্ম অনুসারে দেহ লাভ করে ও সুকর্মের ফলে স্বর্গ ভোগ করে। আত্মা কর্তা, তাই ক্রিয়া করবার ও ফল ভোগ করবার শক্তি তার আছে।

কর্ম ও তার ফল সম্পর্কে একটা নতুন টার্ম ব্যবহার করেছেন মীমাংসকেরা; সেটা হচ্ছে 'অপূর্ব'। ধরো একটা কাজ করলে কাজ শেষেই তো তুমি ফল পাচ্ছ না। তাহলে তুমি যে কাজ করলে সেটা কী হিসেবে রক্ষিত থাকবে ফল না পাওয়া পর্যন্ত? কর্ম একটা শক্তি সৃষ্টি করে, তার নাম 'অপূর্ব'। এই অপূর্ব কর্মের কর্তাকে আশ্রয় করে থাকে এবং যথাসময়ে ফল দান করে। প্রত্যেক ক্রিয়ার একটা করে অপূর্ব হয়। সৎকাজের যে অপূর্ব তারই আরেকটা নাম পুণ্য।

– মীমাংসা দর্শনের লক্ষ্য কি ছিল শুধু ঝগড়া মেটানো?

https://nagorikpathagar.org

– না, আরেকটা লক্ষ্য ছিল। সেই সময় বৌদ্ধ আর জৈন ধর্মের প্রভাবে হিন্দু ধর্ম বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিল। তাই বেদের আত্মরক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সেই সময় দুই মীমাংসাই বেদের বিরোধীদের বিরুদ্ধে একসাথে যুদ্ধে নামে।

– সেটা কোন সময়ে?

– সপ্তম থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। শঙ্করাচার্যও একজন প্রসিদ্ধ মীমাংসক। তাঁর চিন্তা বলব তোমাকে।

– তাহলে আবার উত্তর আর পূর্বে আলাদা হলো কেন মীমাংসকেরা?

– পূর্ব-মীমাংসা বেদের কর্ম, উপদেশ বা কর্মকাণ্ড নিয়ে কথা বলে, অর্থাৎ সংহিতা ও ব্রাহ্মণ পূর্ব-মীমাংসার অন্তর্গত। আর উত্তর-মীমাংসা বেদের জ্ঞান কাণ্ড বা বেদান্ত বা উপনিষদ নিয়ে কথা বলে। দুইয়ের তো প্রভেদ আছেই। যুদ্ধের সময় এক ছিল, কারণ দুই পক্ষের শক্তির দরকার ছিল। আবার এরপরে শান্তির সময়ে বিভেদটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

– আচ্ছা উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত কী এবার বলো।

– ছয়টি আস্তিক দর্শনের মধ্যে বেদান্তই প্রকৃত মোক্ষ শাস্ত্র। বেদান্তই মুক্তির কথা ভেবেছে। মুক্তির কথা বলতে গিয়ে পদার্থের বিবরণ দিয়ে চুপ করে থাকেনি। এই দর্শনের আরম্ভ উপনিষদে – উপনিষদ যেহেতু বেদের অন্ত্যভাগ বা শেষে থাকে তাই তার নাম বেদান্ত।

বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্র' ব্রহ্মবাদ বা বেদান্ত দর্শনের সূত্রগ্রন্থ বলে এটিকে 'বেদান্তসূত্র' নামেও অভিহিত করা হয়। এতে জগৎ ও ব্রহ্মকে দেহ এবং দেহধারী অর্থাৎ শারীরকের ভিত্তিতে বর্ণনা

https://nagorikpathagar.org

করা হয়েছে বলে এটিকে 'শারীরক-সূত্র'ও বলা হয়। এ ছাড়া 'বাদরায়ণসূত্র', 'শারীরক-মীমাংসা', 'উত্তর-মীমাংসা', 'ব্রহ্ম-মীমাংসা' প্রভৃতি নামেও তা পরিচিত।

ব্রহ্মসূত্রে চারটি অধ্যায় – সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন ও ফল। প্রতিটি অধ্যায়ে আবার চারটি করে পাদ রয়েছে, যার মোট সূত্রসংখ্যা পাঁচশ পঞ্চান্নটি। প্রথম অধ্যায়ে বিভিন্ন উপনিষদের বাক্যসমূহে প্রকাশিত অর্থের সমন্বয়সাধন করে এক, অদ্বিতীয়, নির্গুণ, নির্বিশেষ ব্রহ্মের স্বরূপ ও ব্রহ্মের সঙ্গে জগৎ ও জীবের সম্বন্ধ বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিরোধী মত খণ্ডন করে ব্রহ্মের প্রাতিভাসিক, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সত্তার মধ্যে যে কোনো বিরোধ নেই এবং তারা যে এক অবিরোধী সত্তাকেই নির্দেশ করে, তা প্রমাণ করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় (উপাসনা, সাধন ইত্যাদি) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যার ফলস্বরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা মোক্ষের স্বরূপ আলোচনা করা হয়েছে।

ব্রহ্মসূত্রের সূত্রগুলি অতি সংক্ষিপ্ত, অনেক সময় পূর্ণাঙ্গ বাক্যও নয়। এক একটি সূত্রে দুটি বা তিনটি শব্দ আছে। স্বাভাবিকভাবেই সূত্রগুলি অতি দুর্বোধ্য। তাই শুধুমাত্র এই সূত্রগ্রন্থটি পাঠ করে প্রকৃত অর্থ বোঝা খুব কঠিন। সুতরাং কালক্রমে সূত্রকে ব্যাখ্যা করার জন্য রচিত হয়েছে নানা ভাষ্যগ্রন্থ। বেদান্তমত ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে রচিত ভাষ্যগ্রন্থগুলির মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো শঙ্করাচার্যের 'শারীরকভাষ্য'। শঙ্করাচার্য ছাড়াও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা শঙ্করের পরবর্তীকালে যাদব প্রকাশ, ভাস্কর, বিজ্ঞানভিক্ষু, রামানুজ, নীলকণ্ঠ, শ্রীপতি, নিম্বার্ক, মধ্ব, বল্লভ এবং বলদেব প্রমুখ অনেকেই রচনা করেন। এই ব্যাখ্যার ভিন্নতাকে কেন্দ্র করে বেদান্ত দর্শনে নানান

https://nagorikpathagar.org

উপসম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। এই উপসম্প্রদায়গুলির মধ্যে আচার্য শঙ্করের 'অদ্বৈতবাদ', রামানুজের 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ', মধ্বের 'দ্বৈতবাদ' বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। বেদান্তের অন্যান্য উপসম্প্রদায়গুলির মধ্যে নিম্বার্কের 'ভেদাভেদবাদ', বল্লভাচার্যের 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ', ভাস্করের 'ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ', শ্রীকণ্ঠের 'বিশিষ্টশিবাদ্বৈতবাদ', বলদেব বিদ্যাভূষণের 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' উল্লেখযোগ্য।

ব্রহ্মই এ বিশ্বের কারণ, ব্রহ্মজ্ঞান হতেই জীবের পরম কাম্য মোক্ষ লাভ হয়; একমাত্র শাস্ত্রের মাধ্যমেই ব্রহ্মকে জানা সম্ভব, শুধু তর্কের দ্বারা নয় – এ সকল বিষয়ে সকল ভাষ্যকারই ঐকমত্য পোষণ করেন।

– তাহলে এরা আলাদা কেন?

– ব্রহ্মের স্বরূপ, জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের কার্যকারণ সম্বন্ধ, জীবাত্মার সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক, এবং মুক্ত অবস্থায় আত্মার স্বরূপ কী ইত্যাদি বিষয়ে ভাষ্যকারদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। সে-কারণেই এই ভিন্ন ভাষ্য।

– আচ্ছা। তাহলে তফাতগুলো কী কী?

– আচার্য শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ, শাশ্বত, শুদ্ধ-চৈতন্য স্বরূপ। অদ্বৈতবেদান্ত মতে নির্গুণ ব্রহ্মই একমাত্র বা অদ্বিতীয় সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন। অজ্ঞানবশে আমরা পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তাকে সত্য বলে মনে করি, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের উদ্ভব হলে বোঝা যাবে চিৎ বা চেতনাস্বরূপ আমি একমাত্র সত্য। তারই নাম ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম নির্গুণ। ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় কিছুর কল্পনা অজ্ঞানের পরিণাম। এই অজ্ঞানের নামান্তর মায়া; তাই অদ্বৈতবাদকে মায়াবাদ বলেও

https://nagorikpathagar.org

উল্লেখ করা হয়। শঙ্করের মতে ঈশ্বর হলেন মায়া সৃষ্ট নির্গুণ ব্রহ্মের জীবাত্মার বুদ্ধিগ্রাহ্য সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। জগৎ হলো নির্গুণ ব্রহ্মেরই মায়াসৃষ্ট বিবর্ত – যার কোনো বাস্তব সত্তা নেই।

অন্যদিকে, রামানুজ এবং অন্যান্য ভাষ্যকারদের মতানুসারেও যদিও ব্রহ্মই চূড়ান্ত সত্য, তবুও ব্রহ্মকে নির্গুণ আখ্যা দেয়া ভুল; বরং তাঁকে অনন্ত কল্যাণ-গুণসম্পন্ন সাকার ঈশ্বর মনে করতে হবে। তাঁরা শঙ্করের মায়াবাদকে স্বীকার করেন না। কারণ তাঁদের মতে জগৎ সত্য এজন্য যে, জগৎ ব্রহ্ম হতেই উৎপন্ন হয়েছে।

বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত মতে ব্রহ্মই ঈশ্বর; উপাসনা ও সৎকর্মের সাহায্যে তার করুণার উদ্রেক করতে পারলেই জীবের মুক্তি। পরিদৃশ্যমান জড়জগৎ এবং জীবাত্মার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য মিথ্যা নয়। কেননা ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের মধ্যেই চিৎ এবং অচিৎ – অর্থাৎ চেতনা এবং জড় – উভয় বৈশিষ্ট্যই বর্তমান। চিৎ বৈশিষ্ট্য থেকেই জীবাত্মার সৃষ্টি এবং অচিৎ থেকে জড়জগতের। ব্রহ্ম চিৎ-অচিৎ বিশিষ্ট। জীবাত্মার সঙ্গে জড়দেহের সম্পর্কই বন্ধনের স্বরূপ এবং তার মূলে আছে জন্মজন্মান্তরের কৃতকর্মজনিত অজ্ঞান। ঈশ্বরের করুণায় জীবাত্মা এই অজ্ঞান কাটিয়ে মুক্তিলাভ করবে।

তবে মাধ্বাচার্য কিন্তু ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত-কারণ মাত্র বলেই গ্রহণ করেন। তাঁদের মতে জীব বাস্তবিকই অণু, কর্তা এবং ঈশ্বরেরই অংশবিশেষ। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ দেবযানের পথে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মে লীন হন এবং আর মর্ত্যলোকে প্রত্যাবর্তন করেন না। তাঁরা শঙ্করের মতো জ্ঞানকে উচ্চ বা নিম্ন বলে পার্থক্য করেন না। তাঁদের মতে জ্ঞান নয়, ভক্তিই মুক্তিলাভের প্রধান উপায়।

https://nagorikpathagar.org

https://nagorikpathagar.org

এ প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্র ছাড়াও বেদান্ত দর্শনের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসমুখ রয়েছে, সেটি হলো শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বা গীতা বলে যেটাকে জানি আমরা। অর্জুনের উদ্দেশে জীব, জগৎ ও পরমাত্মা বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত জ্ঞান-বাণীর সংকলনই ভগবদ্গীতা। ভগবদ্গীতাই বেদান্ত চিন্তাধারার চরম ও পরম পর্যায় বলে মনে করা হয়। তাই বলা হয়ে থাকে, উপনিষদ হলো বেদান্ততত্ত্বের 'শ্রুতিপ্রস্থান', ব্রহ্মসূত্র বেদান্ততত্ত্বের 'ন্যায়প্রস্থান' এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বেদান্ততত্ত্বের 'স্মৃতিপ্রস্থান'। এই তিন শাস্ত্রকে একসাথে বলা হয় 'প্রস্থান-ত্রয়ী'।

– এটা বুঝলাম, কিন্তু আগে যে বলেছিলে, জগৎ মায়া, এই কথাটা বুঝলাম না।

– এইটা একটা ভালো প্রশ্ন করেছ। তুমি ম্যাজিক দেখেছো না?

– হুঁ, দেখেছি। মানুষকে ভ্যানিশ করে দিয়ে আবার আরেক জায়গায় হাজির করে ম্যাজিশিয়ান।

– একদম ঠিক। এই যে এক জায়গায় ভ্যানিশ করে আরেক জায়গায় হাজির করে। এর মাঝখানে কী ঘটেছে সেটা তুমি জানো না, তাই এটা ম্যাজিক। তাই না?

– হুঁ, তাই।

– জানলে এটা আর ম্যাজিক থাকত না, তোমার জ্ঞান হয়ে উঠত। তাই না?

– হুঁ, তাই।

– ম্যাজিককে কিন্তু আমরা ইন্দ্রজাল বা মায়া বলি। ওই না জানা অংশটুকুর জন্য। মায়াবাদও ঠিক তাই। আমার অজ্ঞানতার

https://nagorikpathagar.org

অংশের জন্য আমরা যে জগৎ দেখি সেই জগৎ সত্য নয়। শঙ্করাচার্যের চিন্তায় তার একটা বিশেষ রূপ ধারণ করেছে। উপরে আমরা জগৎকে মায়া মেনেছি যেহেতু যা দেখছি তা-ই সত্য নয়, দেখার বাহির- মহল ছেড়ে বস্তু ও বাস্তবতার অন্দরমহলে প্রবেশ বা অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেয়ার তাগিদে। জগৎকে মায়া বলা যায় এই অর্থে যে, যা প্রত্যক্ষ করছি তা-ই জ্ঞান নয়। প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়োপলব্ধির জগৎ আর জ্ঞানের জগতের মধ্যে পার্থক্য আছে। যা দেখছি, উপলব্ধি করছি, বা যা বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হচ্ছে এটাকে জ্ঞানে রূপান্তর করতে হলে তাকে বুদ্ধি ও বিচারের অধীন করা দরকার। বুদ্ধি ও বিচারের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই অভিজ্ঞতা জ্ঞানের রূপ ধারণ করে। আমরা তার সত্য নির্ণয় করি। জর্মন দার্শনিক ইম্মেনুয়েল কান্ট জ্ঞান বা সত্যের এই স্তরের পরেও আরেকটি স্তরের কথা আমাদের বলেছেন। সেটা প্রজ্ঞা।

– জ্ঞানের স্তর আর প্রজ্ঞার স্তরের মধ্যে তফাত কী?

– জ্ঞানের স্তরে যুক্তি বা বিচারের স্ববিরোধিতা যায় না। যেমন যুক্তি দিয়ে ঈশ্বর, আত্মা বা জগৎকে সত্য প্রমাণ করা যায়, আবার মিথ্যাও প্রমাণ করা যায়। প্রজ্ঞার স্তরে আমরা বুদ্ধি বা মানুষের বিচারশক্তির সীমা ও স্ববিরোধিতা সম্পর্কে সচেতন ও সজ্ঞান হয়ে উঠি। সেই কারণে শঙ্কর মায়াকে মিথ্যা বলেননি, মিথ্যা দাবি করেননি। মায়া বাস্তব বা অবাস্তব কিছু নয়।

– বুঝলাম না, সহজ করে বলো।

– আরও সহজ ও সোজা করে বললে আমরা বলতে পারি, ইন্দ্রিয় বা উপলব্ধি স্তরের যে জগৎ সেটা মায়ার জগৎ। এই

https://nagorikpathagar.org

স্তরে জগৎকে আমাদের বিচিত্র, বিভিন্ন ও বহুতে আনন্দিত বলে মনে হয়। একে যেহেতু সরাসরি আমরা উপলব্ধি করতে পারি অতএব এই জগতের প্রতি আমাদের টান বা মায়াও অধিক। জগতে দৃশ্যমান এই অনেক বা বহু থেকে 'এক'কে নির্ণয় করা চিন্তার কাজ। ওর মধ্য দিয়ে মূর্ত জগতের বিমূর্তায়ন ঘটে। তার দরকার আছে। কিন্তু মূর্ত জগৎকে অস্বীকার করে যখন বিমূর্তকেই শুধু সত্য বলা হয়, তখন ভয়ানক বিপদ তৈরি হয়। বিমূর্ত তখন মূর্ত জগৎকেই ধ্বংস করে দিতে চায়। যে কোনো ধর্মচিন্তা যখন ঈশ্বর বা ব্রহ্মকেই একমাত্র সত্য আর সবকিছুকে মিথ্যা দাবি করে তখন এই বিপদের গজব পড়তে শুরু করে। উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেই উভয়কে বুঝতে হবে। শঙ্করাচার্য বিশ্বসত্তাকে অবিভাজ্য এবং এক কল্পনা করেছেন। তাঁর মতবাদকে সে-কারণে অদ্বৈতবাদ বলা হয়। কিন্তু জগৎ মিথ্যা বলার পেছনে তার উদ্দেশ্য ছিল সেই সত্য প্রতিষ্ঠা যে, জীবাত্মা ও ব্রহ্ম এক এবং অভিন্ন। যে-জগৎ প্রত্যক্ষ হচ্ছে তা সততই পরিবর্তনশীল। নাম ও রূপ এই দুয়ের সমন্বয়ে এই পরিবর্তন ঘটছে। এর ফলে জগৎ সম্পর্কে আমাদের যে ভ্রম উপস্থিত হয় সেটা সাপকে দড়ি ভেবে ভুল করার মতো ব্যাপার। এই ভুলের কারণ হলো মায়া।

তুমি হিন্দুদের উপাসনার নানা জায়গায় যে ওঙ্কার (ওম্)-কে দেখো, ছান্দোগ্য উপনিষদে সেটার একটা ব্যাখ্যা দেয়া আছে। এই ওঙ্কারই বিশ্বরূপ, ওঙ্কারই সব।

> প্রজাপতি ব্রহ্মা (সৃষ্টিভিলাষী হয়ে) লোকসমূহকে অভিধ্যান করলেন। তার ফলে সমুদয় লোক হতে ত্রয়ী-বিদ্যা অর্থাৎ বেদবিদ্যা নিঃসৃত হলো। এরপর তিনি বেদবিদ্যার ধ্যান করলেন। ফলে সেই বেদবিদ্যা থেকে বেরিয়ে এলো তিনটি অক্ষর – ভূঃ (পৃথিবী), ভুবঃ (অন্তরীক্ষ) আর স্বঃ (দ্যুলোক)।

https://nagorikpathagar.org

এরপর প্রজাপতি ঐ তিনটি অক্ষরকে অভিধ্যান করলেন। ফলে, অক্ষরগুলো থেকে নিঃসৃত হলো ওঙ্কার। গাছের পাতা-জুড়ে যেমন পাতার শিরা, বা পাতার সব অংশই যেমন শিরার সঙ্গে যুক্ত, তেমনি সব কিছুর মধ্যে ওঙ্কার ব্যাপ্ত। সব কিছুই যুক্ত ওঙ্কারের সঙ্গে। বিশ্ব-চরাচরে যা কিছু আছে, সবই আছে ওঙ্কারে। ওঙ্কারই বিশ্বরূপ। সবই ওঙ্কার। সবই ওঙ্কার। (ছান্দোগ্য – ২/২৩/৩)।

আজকের আলোচনা শেষ। পরে আরেকদিন। তাহলেই মোটামুটি ভারতীয় দর্শনের আলোচনা শেষ হবে।

– বাহ! তাহলেই আমি ক্ষুদে দার্শনিক হয়ে যাব!

– হা হা হা!

https://nagorikpathagar.org

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে পুত্র প্রথমে প্রশ্ন করে।

– উপনিষদের মূল চিন্তা কী ছিল?

– উপনিষদ নিয়ে আমরা কিন্তু অনেক কথা বলছি। উপনিষদের চিন্তার মূল লক্ষ্যই ছিল পরম সত্তা হিসেবে ব্রহ্মভাবনা এবং ব্রহ্মের সাথে সবকিছুকে মিলিয়ে দেয়ার প্রয়াস। এই পরম সত্তাই উপনিষদে কখনো ব্রহ্ম, কখনো আত্মা, কখনো ভগবান, কখনো কেবলমাত্র সৎ বলে অভিহিত হয়েছে।

তোমাকে একটা মজার বিষয় বলি। একটা উপনিষদ আছে কেন-উপনিষদ। মনে আছে উপনিষদের যে একটা তালিকা দেখেছিলাম আমরা?

– হ্যাঁ, মনে আছে।

– এটার নাম 'কেন' হলো কেন জানো? প্রশ্নময় 'কেন' দিয়ে শুরু হয়েছে বলে এই উপনিষদটির নাম হয়েছে কেনোপনিষদ।

– আচ্ছা!

https://nagorikpathagar.org

– কঠ-উপনিষদ নামে যে-উপনিষদ আছে, এই উপনিষদেই মৃত্যুর অধিপতি যমের সঙ্গে বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ কিশোর নচিকেতার কথোপকথনকে কেন্দ্র করে প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকার মাধ্যমে আত্মজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছে। মোহিতলাল মজুমদারের একটা কাব্যনাটক আছে 'মৃত্যু ও নচিকেতা' নামে। মানে যম আর নচিকেতার গল্প।

– যম আর নচিকেতার গল্পটা কী?

– বাজশ্রবা নামে এক মুনি ছিলেন। তিনি ছিলেন পরম ধার্মিক। তার এক পুত্র ছিল, নাম নচিকেতা।

বাজশ্রবা মুনি একবার এক বিরাট যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞের নাম বিশ্বজিৎ যজ্ঞ। যেমন যজ্ঞ, তেমন তার দক্ষিণা। এই যজ্ঞের নিয়ম হচ্ছে যিনি জজ্ঞ করেন তার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তুকেই যজ্ঞের দক্ষিণারূপে দান করতে হয়।

বাজশ্রবা দান করছেন অনেক গরু। নচিকেতা ভাবলেন, তিনি বাজশ্রবার পুত্র। পুত্রই তো পিতার সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন।

কাজেই তাকে যদি দান করা না হয়, তবে তো যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফল তার পিতা পাবেন না। এই ভেবে তিনি বাজশ্রবা মুনির কাছে গিয়ে বললেন :

'পিতা আপনি আমাকে কার কাছে দান করবেন?'

বাজশ্রবা কোনো উত্তর দিলেন না। একবার, দুইবার, তিনবার – নচিকেতা তার বাবাকে একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন। তখন বাজশ্রবা বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন :

'আমি তোমাকে যমের হাতে তুলে দেব।'

https://nagorikpathagar.org

পিতার কথা শুনে নচিকেতা ভাবলেন :

'আমি তো পিতার শিষ্যদের মধ্যে হীন নই; তবে কেন অন্য কাউকে যমের কাছে না পাঠিয়ে আমাকে পাঠাতে চাইছেন? নিশ্চয়ই কোনো গুরুতর প্রয়োজন আছে, যে কারণে আমারই যমের কাছে যাওয়া প্রয়োজন।'

এই ভেবে নচিকেতা স্থির করলেন তিনি যমের কাছে যাবেন। কিন্তু বাজশ্রবা সত্যিই তো আর তাকে যমের বাড়ি পাঠাতে চাননি! বিরক্ত হয়ে শুধু একটা কথার কথা বলেছিলেন। তাই নচিকেতা যখন যমের বাড়ি যেতে চাইলেন, তখন তিনি তাকে বাধা দিলেন। সত্যিই তো, কেউ ইচ্ছে করে কি আর নিজের প্রিয় পুত্রকে যমের হাতে তুলে দিতে পারে?

পিতার নিষেধে নচিকেতা কিন্তু মত পরিবর্তন করবেন না। তিনি ভাবলেন, যজ্ঞের সামনে বসে তিনি আমাকে যমের হাতে দান করেছেন। এখন যদি তিনি সে-কথা ফিরিয়ে নিতে চান, তবে যজ্ঞের ফল পাবেন না, অধিকন্তু সত্যভ্রষ্ট হয়ে আরো পাপের ভাগী হবেন। কাজেই পিতার সত্যরক্ষার জন্যও আমাকে যমের বাড়ি যেতে হবে।

এই সমস্ত ভাবনা-চিন্তা করে নচিকেতা তার বাবাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন : 'পিতা, আপনার পিতা-পিতামহগণের কথা চিন্তা করুন। তারা সত্যনিষ্ঠ ছিলেন, কোনো দিন, কোনো কারণেই তারা সত্যভ্রষ্ট হননি; অন্যান্য সৎ ব্যক্তিরাও সত্য থেকে সরে যাননি। কাজেই আপনি-বা কেন সত্যভ্রষ্ট হবেন? আর তাছাড়া মানুষের জীবনের মূল্য কী? শস্য যেমন কিছুদিন পর মরে যায়, মানুষও তেমনি মরবেই। কাজেই এই মরণশীল মানুষের জন্য কেন সত্যভ্রষ্ট হবেন? আমি আজ যদি যমালয়ে

https://nagorikpathagar.org

না যাই, পরে যেতেই হবে; কাজেই দুঃখ করবেন না – আমাকে যেতে দিন।'

বাজশ্রবা বুঝলেন আপত্তি করে কিছু হবে না। অতঃপর নচিকেতা যমালয়ে রওনা হয়ে গেলেন। নচিকেতা যখন যমের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন যম বাড়ি ছিলেন না। নচিকেতা সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলেন। একদিন, দুদিন, তিনদিন পার হয়ে গেল। নচিকেতা একঠাঁই বসে আছেন – স্নান নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই।

তিনদিন পর যম বাড়ি ফিরে শুনলেন, তিনদিন ধরে অনাহারী অতিথি ব্রাহ্মণ তাঁর ঘরে অপেক্ষা করছেন। এই সংবাদ পেয়ে যম অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠলেন, কারণ ব্রাহ্মণ বাড়িতে এলে যদি তাকে শান্ত না করা যায়, তবে গৃহস্থের মঙ্গল নেই। কাজেই সত্বর পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে নচিকেতাকে শান্ত করতে গেলেন। যমরাজা যথাযোগ্য সমাদর করে নচিকেতাকে বললেন :

'হে ব্রাহ্মণ, তুমি অতিথি হয়েও আমার গৃহে তিন রাত্রি অনাহারে কাটিয়েছ, তাই তোমাকে নমস্কার করি। তোমার ক্রোধে আমার যেন কোনো অমঙ্গল না হয়। তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন হয়েছি – প্রতি রাত্রির জন্যে একটি করে তুমি তিনটি বর প্রার্থনা করো, আমি পূর্ণ করব।'

তখন নচিকেতা তিনটি বরই প্রার্থনা করলেন। প্রথম বরে বললেন : 'হে যমরাজ, তিনটি বরের মধ্যে আমি প্রথম বর চাই – আমার জন্য আমার পিতার মনে যেন কোনো উদ্বেগ না থাকে, আমার প্রতি যেন তিনি ক্রোধশূন্য ও প্রসন্ন হন। আর যমালয়ে গত ব্যক্তির সঙ্গে মর্ত্যলোকের কারো পরিচয় থাকে না, কিন্তু আমার পিতার সঙ্গে যেন আমার ঐরূপ সম্বন্ধ না

https://nagorikpathagar.org

ঘটে। তিনি যেন আমায় চিনতে পারেন।'

যম সন্তুষ্ট হয়ে বললেন : 'তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হোক। তোমার পিতা পূর্বে তোমার প্রতি যেরূপ স্নেহপরায়ণ ছিলেন, তোমায় চিনতে পারতেন, ভবিষ্যতেও সেরূপ থাকবেন। মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে যাবার পর আমার আদেশে তিনি ক্রোধশূন্য হবেন এবং বহুরাত্রি সুখে নিদ্রা যাবেন। এক্ষণে দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করো।'

দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করে নচিকেতা বললেন : 'স্বর্গলোকে কোনো ভয় নেই – সেখানকার অধিবাসীরা আপনার ভয়ে কখনও ভীত হয় না। সেখানে লোক বৃদ্ধ হয় না, লোকের ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে না – আনন্দের মধ্য দিয়ে তারা দিনযাপন করে। হে যমরাজ, অগ্নিবিদ্যার প্রভাবে যারা এই অমরত্ব লাভ করে, তাদের সেই অগ্নিবিদ্যার রহস্য আপনি জানেন। এই রহস্য আমায় বলুন – দ্বিতীয় বরে এটাই আমি প্রার্থনা জানাই।'

তখন যমরাজ অগ্নিবিদ্যা প্রকাশ করলেন। নচিকেতাও শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে শিষ্যের মতো সমস্ত শুনলেন। নচিকেতা শিষ্যত্ব গ্রহণ করায় যমরাজ প্রীত হয়ে তাকে তিনটি ববের অতিরিক্ত একটি বর দিয়ে বললেন :

'স্বেচ্ছায় তোমাকে এই চতুর্থ বর প্রদান করছি। অতঃপর অগ্নি তোমার নামেই প্রসিদ্ধ হবেন। যিনি তোমার নামে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করবেন, তিনিও জন্মমৃত্যু অতিক্রম করবেন। এক্ষণে তোমার তৃতীয় বর প্রার্থনা করো।'

তখন নচিকেতা বললেন : 'মানুষের মৃত্যুর পর এই সংশয় উপস্থিত হয় – আত্মা আছে কি নেই, দয়া করে আমাকে মৃত্যুর এই স্বরূপের বিষয় বলুন। এটাই আমার তৃতীয় প্রার্থনা।'

https://nagorikpathagar.org

যম নচিকেতাকে পরীক্ষা করবার জন্যে বললেন : 'দেবতারাও এই তত্ত্ব জ্ঞাত নহেন। কাজেই তুমি এই বর ত্যাগ করো, অন্য বর প্রার্থনা করো।'

যখন দেবতারাও জানেন না তখন মৃত্যুর স্বরূপ নিশ্চয়ই অত্যন্ত রহস্যময়, এই ভেবে নচিকেতা যমকে বললেন : 'না প্রভু! আমাকে এই তত্ত্বই বলুন – অন্য কোনো প্রার্থনা আমার নেই।'

যম নচিকেতাকে লোভ দেখিয়ে বললেন : 'তুমি দীর্ঘায়ু পুত্র-পৌত্রসমূহ প্রার্থনা করো; বহু গবাদি পশু, হস্তী, স্বর্ণ কিংবা বিশাল রাজ্য প্রার্থনা করো; কিংবা অমরত্ব – আমি তোমার সমস্ত প্রার্থনা পূর্ণ করব, শুধু মৃত্যুর স্বরূপ জানতে চেয়ো না।'

নচিকেতার জেদ চড়ে গেল – তিনি মৃত্যুর স্বরূপই জানবেন, তাই বললেন : 'মানুষ কখনও ধন-রত্ন নিয়ে সুখী হতে পারে না, আমার কামনা থাকলে আপনার কৃপায় প্রচুর বিত্ত কিংবা অমরত্বও পেতে পারি; কিন্তু সে-বিষয়ে আমার কামনা নেই – আমাকে মৃত্যুর স্বরূপ বলুন।'

যম সন্তুষ্ট হয়ে বললেন : 'নচিকেতা, তোমায় পরীক্ষা করে দেখলাম, তুমি লোভহীন; সাধারণ মানুষ যা চায়, তুমি তা চাও না – তুমি প্রকৃত বিদ্যাভিলাষী, তাই উপযুক্ত শিষ্য ভেবে দেবতাদেরও অজ্ঞাত মৃত্যুতত্ত্বের বিষয় তোমাকে জানাব?'

এই বলে যম মৃত্যুর স্বরূপ সম্বন্ধে নচিকেতাকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করলেন। এই ব্রহ্মবিদ্যা জ্ঞাত হয়ে নচিকেতাও জরামৃত্যুর অতীত মুক্তি লাভ করলেন।

– বাহ, বেশ মজার গল্প তো! আচ্ছা, সেই ছকে আমি দেখেছিলাম অনেক উপনিষদ। উপনিষদের মোট সংখ্যা কত?

https://nagorikpathagar.org

– উপনিষদ তো সংখ্যায় দুশোর বেশি। আমি তোমাকে নামকরাগুলোর নাম বলেছি শুধু। যেমন ধরো মুণ্ডক উপনিষদ। মুণ্ডক শব্দের আক্ষরিক অর্থ যিনি মুণ্ডিত। অর্থাৎ মুণ্ডিত মস্তক গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। ধারণা করা হয়, এই উপনিষদে নিজের এবং জগতের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞতা দূর করে ব্রহ্ম বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে মুণ্ডিত মস্তক তথা সন্ন্যাসীদের জন্য। অজ্ঞতা দূর করাই মুণ্ডক উপনিষদের লক্ষ্য। এই উপনিষদের বক্তা ঋষি হচ্ছেন অঙ্গিরা, আর শ্রোতা ছিলেন ঘোর সংসারী শৌনক, যিনি আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে পরে ঋষি হয়ে গিয়েছিলেন।

– শৌনক তো আমার এক বন্ধুর নাম!

– নামটা এখান থেকেই নেয়া। উপনিষদগুলিতে দার্শনিক তত্ত্বাবলি আলোচিত হলেও সে-আলোচনা বহুলাংশেই বিক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট। তাছাড়া এ আলোচনা যুক্তিতর্কমূলক সুসংবদ্ধ দার্শনিক আলোচনা নয়, এবং নানা উপনিষদে নানারকম আলোচনার মধ্যে ঠিক কোন্ তত্ত্বকে প্রকৃত উপনিষদ-প্রতিপাদ্য তত্ত্ব বলা হবে সে-কথা নির্ণয় করাও সহজ নয়। পরমাত্মা বা পরমব্রহ্মই যদিও সাধারণভাবে উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়, তবুও বিভিন্ন উপনিষদে একধরনের সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মবাদ, নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মবাদ, ব্রহ্মপরিণামবাদ, ব্রহ্মবিবর্তবাদ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। এবং ব্রহ্ম, জীব ও জগতের পারস্পরিক সম্বন্ধ, এমনকি জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হিসেবে মোক্ষের স্বরূপ ও উপায় নিয়েও বিভিন্ন সিদ্ধান্ত লক্ষ করা যায়। উপনিষদগুলির মধ্যে নিহিত চিন্তাগুলিকে সুশৃঙ্খলভাবে সংবদ্ধ করার প্রয়োজনে এগিয়ে আসেন মহর্ষি বাদরায়ণ তাঁর ব্রহ্মবাদী সূত্রগ্রন্থ 'ব্রহ্মসূত্র' নিয়ে। এই ব্রহ্মসূত্রই বেদান্ত দর্শনের সূত্রগ্রন্থ

https://nagorikpathagar.org

এবং তা বেদান্তসূত্র নামেও পরিচিত।

– আচ্ছা। এরপর কী?

– এরপর। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। এটা নিয়েও তো আমরা কদিন আগে বলেছি।

– হ্যাঁ, তবু আবার একটু বলো।

– হিন্দু ধর্মমতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী। এটি মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে সংক্ষেপে ভগবদ্গীতা বা শ্রীগীতা বা আরো সংক্ষেপে গীতা বলা হয়। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ময়দানে কৌরবসৈন্য ও পাণ্ডবসৈন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শুরুতে অন্যপক্ষের আত্মীয়দের হত্যা করতে হবে ভেবে পাণ্ডব সেনাপতি অর্জুন কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এবং ধনুর্বাণ ত্যাগ করেন। তখন অর্জুনের রথের সারথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে অর্জুনের মোহ দূর করে স্বকর্মে প্রবৃত্ত করেছিলেন, তা-ই ভগবদ্গীতা।

গীতার মতে, ফলাসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমান বন্ধনের কারণ। আসক্তি ও অহংবুদ্ধি ত্যাগ করে ফলাফলে উদাসীন হয়ে কর্ম-সম্পাদনে বন্ধন হয় না। অর্থাৎ সর্বকর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করে ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন ও অহংবুদ্ধি বা কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করাই নিষ্কাম কর্মের লক্ষণ। কিন্তু আত্মজ্ঞান ব্যতীত এই আসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমান দূর হয় না। অতএব কর্মযোগ সিদ্ধিলাভের জন্য জ্ঞানলাভের দরকার। আত্মজ্ঞান লাভ হলে ভগবানে পরমভক্তি জন্মায়। এর মাধ্যমেই সমত্ব-বুদ্ধি বা সম্যক-জ্ঞান জন্মায়। এই সমত্ব বুদ্ধিকেই বলা হয় স্থিতপ্রজ্ঞা।

https://nagorikpathagar.org

বিহিত কর্ম মানে আরোপিত কর্ম, যা ঈশ্বর কর্তৃক নির্দেশিত। কর্মফলের আশা ত্যাগ করে আসক্তিহীন কর্মযোগে চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে জ্ঞানরূপ সন্ন্যাসমার্গে উত্তীর্ণ হওয়াই গীতার মতে জীবের মোক্ষ বা সংসার-মুক্তির অনিবার্য শর্ত। কিন্তু ভক্তি বিনে জ্ঞান হয় না। এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভে পরমেশ্বর পরমব্রহ্মের প্রতি অবিচল ভক্তি থাকা প্রয়োজন।

– আচ্ছা। তাহলে এবার আলোচনা শেষ হলো।

– উহুঁ, শুরু হলো। সিনেমায় যেমন ট্রেইলার দেখায়, দর্শনের যে বিশাল জগতে তুমি ঢুকতে যাবে সেই জগতের ট্রেইলার দেখলে মাত্র। যদি আগ্রহ হয় তাহলে হয়তো একদিন পুরো সিনেমাটা দেখতে ইচ্ছে হবে।

– তাহলে কি আমি শাহরুখ খানের সেই বিখ্যাত উক্তি দিয়েই শেষ করব? পিকচার আভি বাকি হ্যায় মেরা দোস্ত?

– হা হা হা হা!

https://nagorikpathagar.org

গ্রন্থপঞ্জি

উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, *ভারতদর্শনসার*, বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা, আশ্বিন ১৩৯১, ১৯০৬ শক।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতীয় দর্শন*, ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ডিসেম্বর ১৯৬০।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *লোকায়ত দর্শন*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ভাদ্র ১৩৬৩।

নুরনবী, *দর্শনের সমস্যাবলী*, মেরিটফেয়ার, ঢাকা।

পণ্ডিত শ্রীনলিনীনাথ মুখোপাধ্যায় (ভাষ্যানুবাদক), *ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত দর্শন*, বসুমতি কর্পোরেশন লিমিটেড।

বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, *সাংখ্য দর্শনের বিবরণ*, (সপ্ততীর্থ) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, আগস্ট ১৯৮৪।

বিশ্বরূপ সাহা, *মীমাংসা পরিচয়*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০২।

মহর্ষি কপিল, *সাংখ্য দর্শন*, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত গদ্যানুবাদ, বসুমতি কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতি সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, নবম সংস্করণ ১৯৯৭।

মহর্ষি পতঞ্জলি, *যোগ-দর্শন*, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, কোলকাতা, একাদশ মুদ্রণ ২০১৫।

মোঃ মাহবুবুর রহমান, *ভারতীয় দর্শন পরিচিতি*, আলেয়া বুক ডিপো, ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *ভারতীয় দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

শ্রী মোহন ভট্টাচার্য, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ডিসেম্বর ২০১৫।

সাইয়েদ আবদুল হাই, *ভারতীয় দর্শন*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৭।

অন্যান্য সহায়ক সূত্র

১. ফরহাদ মজহার, 'মায়া', *সমকাল* (দৈনিক), ২৫শে মার্চ ২০১২।

২. রণদীপম বসুর ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে ব্লগ ranadipambasu.com থেকে অনুমতি নিয়ে নানা লেখা এই বইয়ের দর্শনের বর্ণনায় ব্যবহার করা হয়েছে।

https://nagorikpathagar.org

পিতা আর পুত্রের সংলাপের মধ্যে দিয়ে
ভারতীয় দর্শনের আলোচনা। ঝরঝরে গদ্যে লেখা
এই বই কিশোর তরুণদের দর্শন পাঠে
আগ্রহী করে তুলবে।

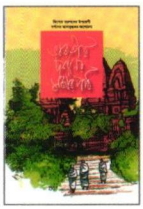

Varotiyo Dorshoner Mojar Path
(Amazing reading of Indian Philosophy)
by Pinaki Bhattacharya

Cover design
Guided by Rajib Dutta's artwork
Price: Taka 300 only
facebook.com/baatigharctg

A Baatighar
Publication

9 789848 825686

https://nagorikpathagar.org